

প্রথম অধ্যায়

যায় মানুষ, ফিরে দেবতা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল সাতটা। শ্রীম চেয়ারে বসা দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া আছেন বিনয় ও জগবন্ধু। শ্রীম কিছুদিনের জন্য তপস্যায় যাইবেন বাহিরে। পুরীর কথা হইতেছে। আবার কখনও বৈদ্যনাথধামের কথাও হইতেছে। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রমহারাজ (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) নিজে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। আবার বারবার পত্র লিখিতেছেন যাইবার জন্য। এখনও নিশ্চয় হয় নাই কোথায় যাইবেন। উভয় স্থানেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। বৈদ্যনাথ শিবক্ষেত্র যোগভূমি। আবার দেবীর হৃদয়পীঠ। একান্ত স্থান। চারিদিক উন্মুক্ত — কোথাও পাহাড়। এখানে ঠাকুরের ভক্ত সাধুগণ রহিয়াছেন।

অন্যদিকে আবার জগন্নাথ ও চৈতন্যদেবের টান। ঠাকুর শ্রীমকে বলিয়াছিলেন— আমিই জগন্নাথ, আমিই গৌরাঙ্গ! নিজে জগন্নাথ-ধামে যান নাই। বলিতেন, পুরী গেলে শরীর যাবে মহাভাবে। চৈতন্য (গৌরাঙ্গ) - অবতারের চব্বিশ বছরের লুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হইবে। কিন্তু শ্রীমকে পাঁচ ছয়বার সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অপ্রকটের পূর্বে। আবার এই চক্ষুে জীবন্ত চৈতন্যসংকীর্তন দর্শন করিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর পথে — সপার্ষদ। তাহাতে শ্রীমকেও দেখিয়াছিলেন। তাই আবার বলিয়াছিলেন, তোমার চৈতন্যভাগবতপাঠ শুনে তোমায় চিনেছি। এক সত্ত্বা, যেমন পিতা ও পুত্র।

শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্শদ। চৈতন্য অবতারেও তাঁহার লীলা-সহচর ছিলেন। তাই তিনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। ইদানীং শ্রীম জগন্নাথ ও চৈতন্যভাবে বিভোর। কখনও বলেন, জগন্নাথের ডাক এসেছে। শেষ অবধি জগন্নাথ-চৈতন্যের ডাকে সাড়া দিলেন বলিয়া মনে হয়। কি কি

দ্রব্য সঙ্গে যাইবে তাহার একটা ফর্দ করিতেন বিনয়কে বলিয়াছিলেন। বিনয় আজ সেই ফর্দ দিলেন। তিনি উহা নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করিতেছেন। এইবার মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অপ্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে না যায়। আবার প্রয়োজনীয় জিনিসও যতটা না হলে নয় ততটা নেওয়া। (ফর্দ দেখাইয়া) এইগুলি বাদ দিলেও হয়।

তপস্যার ভাবে যেতে হয় এইসব মহাতীর্থে। শরীরটা রক্ষা হয় যতটায়, ততটা নেওয়া। দেহের আরামের জন্য নয় — মনের শান্তির জন্য ঈশ্বরচিন্তার জন্য যাওয়া। বাবুরা যায় ওসব স্থানে অন্যভাবে। দেহের সেবার জন্য যায়। ভক্তরা যাবে মনের সেবা, আত্মার সেবার জন্য। সেখান থেকে যখন ফিরে আসবে, একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে আসবে। শ্রীভগবানের পুত্ররূপে ফিরবে। যাবে পিতার পুত্ররূপে, ফিরবে ঈশ্বরের পুত্র হয়ে — ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’।

সাধু হলে অত কিছুই দরকার নেই। একখানা কম্বল কাঁধে ফেলে চললো। পয়সা নাই রেলের উঠেছে। চেকার ধরেছে। তখন হাতে ইঙ্গিত করে (ডান হাত অর্ধেক উপরে তুলিয়া) এমন করে বলে, নেই কিছু (হাস্য)। আর আমি যাচ্ছি, সঙ্গে কত কিছু যাচ্ছে। (ক্ষণকাল ভাবার পর) কলিকাল! এখন সাধুও বুঝি সঙ্গে কিছু কিছু নেয়।

অন্তবাসী — সন্তুবানন্দজী আমায় লিখেছেন আপনাকে নিয়ে বিদ্যাপীঠে অবশ্য যেতে। সেখানে তাঁরা ঘর সব ঠিক করে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শ্রীম — তা তো হলো। কিন্তু ওখানে যাওয়া বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সব পরের ছেলে নিয়ে ঘর। বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ! ওখানে থাকলে ওসব দেখতে হয়। খালি চোখ বুজে থাকলে পাপ স্পর্শ করবে। এ বয়সে এসব আর পারা যায় না। হেমেন্দ্রমহারাজ বলেন, এখানেই থাকুন বরাবর।

যদি না দেখতে পার তবে ওসব কাজ করা কেন? পরের ছেলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করা — বড়ই responsible (দায়িত্বপূর্ণ) কাজ। বরং গৃহীদের পক্ষে সহজ। তারা নিজের ছেলেকে মানুষ করে। এখানে করা হয় অন্যের ছেলেকে।

তাই তো, দু' দুটো ছেলে মরে গেল! ওরা বলছিল, খেলছিল। ওদিকে কেউ বড় একটা ছিল না। তাই গাছে উঠে ছেলেটি পা পিছলে পড়ে যায়। তাতেই শেষে মৃত্যু। আর একটার কোনও কারণই পাওয়া গেল না। মাত্র অনুমান করা হয়েছে। সত্য ঘটনা কি, তা তিনিই জানেন। কেউ কেউ বলে, সাপে কেটেছে। কিন্তু কেউ দেখে নাই চোখে।

হেমেন্দ্র বললেন, আমিও কেঁদেছি ঐ ছেলে দুটির জন্য। তা কাঁদবে না! অমন করে মানুষ করা হাতে ধরে। আর ছোট ছেলেরা শীগগির ভালবেসে ফেলে!

তাই তো আমরা ওখানে (চারতলায় শ্রীম-র কক্ষের পাশে) ক্লাস রেখেছি ছোট ছেলেদের। ওরা রাস্তায় দেখলে দৌড়ে আসে। কত কথা জিজ্ঞাসা করে, যেমন আপনার লোককে করে। কেন? না, মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে কথা কই। আর ফষ্টিনষ্টি করি, তাই।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হেমেন্দ্র সেদিন এসে হাজির, সঙ্গে নিয়ে যাবে। গাড়ীর টাইম ঠিক করে এসেছে। বললাম, কি করে যাওয়া হয় এখন — মেয়েটির (নাতনীর) অসুখ। হেমেন্দ্র বললে ওসব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি চলুন।

সাধু কিনা, তাই ওরূপ বলে। আমি পরে বলি, তা কি করে হয়? যাদের সঙ্গে এতদিন থাকা গেছে, কি করে তাদের বিপদে ফেলে যাওয়া যায়? তারপর চোখের সামনে জন্মেছে, মানুষ হয়েছে। অমনি বললেই হল? আমার এই কথা শুনে তখন বলে, ঐ ছেলেরা মরলে আমিও খুব কেঁদেছি।

২

এখন সকাল আটটা। শ্রীম দ্বিতলে নামিতেছেন, সঙ্গে বিনয় ও জগবন্ধু। দ্বিতলে দুইজন ভক্তের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা উপরে উঠিতেছিলেন। একজন আসিয়াছেন শ্রীহট্ট হইতে। আর একজন মায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটির লোক। ইঁহার নিকট হইতে শ্রীম দাঁড়াইয়া জয়রামবাটির সমস্ত সংবাদ লইতেছেন। মায়ের পিতৃকুলের সকলের সংবাদ

একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার ঐ গ্রামের অপর লোকদেরও সংবাদ লইতেছেন। ঐ গ্রামের একটি ছেলে শ্রীম-র কাছে থাকে, নাম গোকুল। সে মর্টন স্কুলের কিছু কাজ করে। শ্রীম তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছেন। বলিলেন, বেশ চটপট কাজ করতে পারে। আলস্য নেই।

জয়রামবাটির ভক্ত — ঐ ভাব টিকলে হয়।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — তুমি এতো কম বয়সে এমন পাকা কথা শিখলে কোথায়? তুমি তো খুব পাকা লোক দেখছি!

বলাইয়ের প্রবেশ। এতক্ষণে শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়াছেন বেঞ্চে, দক্ষিণাস্য সিঁড়ির সামনে। ভক্তরাও বসা বাম পাশে। একটু পরে আসিল গোকুল। তারপর আসিল গদাধর, সঙ্গে তাহার পিতা। শ্রীম-র সহাস্য বদন। কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (গোকুল ও গদাধরের প্রতি) — ইনি বললেন, শেষ অবধি এই ভাব টিকলে হয় — আমরা একটি ছেলের প্রশংসা করায়। খুব পাকা লোক। কি আশ্চর্য! এতো অল্প বয়সে অত পাকা কথা কি করে শিখলো?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যার অন্যের উপর অবিশ্বাস তার নিজের উপরও অবিশ্বাস আছে। তা হলেই তার নিজের weakness-গুলি (দুর্বলতা) সর্বদা guard (সচেতন) রাখতে পারে।

একটি ভক্ত (স্বগত) — আমার present stage (বর্তমান অবস্থা) অনেকটা এরূপ।

শ্রীম — আর এক রকম আছে — ভাবে, আমি কি হলুম। তারই বিপদ। যে নিজের defect (দোষ) জানে তার ভয় কম। সে প্রার্থনা করবে তার হাত থেকে মুক্ত হতে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি defect (দোষ) শুধরে দেন।

শ্রীম (জয়রামবাটির ভক্তের প্রতি) — গোকুল যাত্রার দলে ছিল তিনমাস। দেখছি এর এতে ভাল লেগেছে। একদিন যাত্রা করলে রক্ষে নেই, আবার তিনমাস! আবার পঞ্চাশ ঘাট জায়গায় গান গেয়েছে। আচ্ছা, কি পড়েছে ও?

জয়রামবাটির ভক্ত — সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত।

শ্রীম (গোকুলের প্রতি) — ইংরেজী কাগজ পড়বে। যেও, মাঝে

মাঝে গিয়ে বসবে রিডিং রুমে। সময় কম হলেও করে নেবে।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — খুব কাজ করে হুস করে সরে পড়া!

সত্যবানের প্রবেশ, হাতে একখানা চিঠি। প্রণাম করিয়া শ্রীমকে বলিতেছে, সন্ধ্যাবমহরাজ এটা দিয়ে বলতে বলেছেন, আপনি অবশ্যই বিদ্যাপীঠে যাবেন। তাঁরা সকলে উদ্গ্রীব হয়ে আছেন।

শ্রীম — তাই তো! ওদিকে টানছেন জগন্নাথ, আর এদিকে বৈদ্যনাথ। দেখ, কার টান বেশী (হাস্য)। বস্তুত একই সব। কিন্তু ভক্তের রুচিভেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেই এক নানা হয়েছেন। যার যা ভাল লাগে সে তাঁর ভজনা করুক। কিন্তু অন্তরে থাকবে ঐ উদার ভাব — এক ঈশ্বরই বহু হয়েছেন।

শ্রীম (স্বগত) — বৈদ্যনাথ বেশ জায়গা। উন্মুক্ত প্রশস্ত মাঠ। আবার পাহাড় আছে। বেশ নির্জন। পুরীতে আছেন জগন্নাথ আর সাগর। বনও আছে। উভয় স্থান নির্জন। বিদ্যাপীঠে সাধুসঙ্গে থাকা যায়। কিন্তু কর্ম রয়েছে।

শ্রীহট্টের ভক্ত — আমার কাশী যাবার ইচ্ছা! কিছুদিন গিয়ে বাস করতে চাই।

শ্রীম — বেশ ভাল। খাবার সুবিধা বৃন্দাবনে বেশী। মন্দিরের প্রসাদ পাওয়া যায় সামান্য কিছু দিলেই। রান্নাবান্না করতে গেলে ঐতে সময় চলে যায়। বৃন্দাবন কেমন লাগে আপনার?

শ্রীহট্টের ভক্ত — আঙে ভাল। কিন্তু পয়সাকড়ির অভাব। কাশী কাছে।

শ্রীম — আমি কাশী প্রথম যাই যখন, তখন আমার বয়েস সতের। গঙ্গার এপার থেকেই লোক বলতে লাগলো, ঐ কাশী। এই কথা শুনে আমি আনন্দে একেবারে নাচতে লাগলাম। শুনেছি কিনা সর্বদা, লোক কাশী বাস করে ঈশ্বরলাভের জন্য সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। আমার বারচারেক হয়েছে কাশী। শেষবার যাই বছর বার আগে। মা-ঠাকরুন ছিলেন তখন কাশী। আমাদের স্নেহ করতেন কিনা! তখন সবই অন্য রকম লাগতো।

একটি ভক্ত (স্বগত) — মিহিজামের তপোবনে বাস করার সময় ঠাকুরের কৃপার কথা উল্লেখ করে শ্রীম বলেছিলেন — গুরু লাল চশমা পরিয়ে দিয়েছিলেন তাই সব লাল (অর্থাৎ ঈশ্বরময়) দেখতাম। মা-ঠাকরুন কাশীতে থাকায়, তাঁর দিব্যস্নেহে শ্রীম-র কাছে কাশীর রূপই হয়তো বদলে গেছিল। হয়তো দিব্য স্নেহময় আনন্দময় কাশী শ্রীম দর্শন করেছিলেন মায়ের স্নেহকৃপায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, ঠনঠনের মা-কালীর চাহনিটি কি স্নেহপূর্ণ!

শ্রীহট্টের ভক্ত — ইনি কাপড়পরা।

শ্রীম — না, না। চোখদুটির কথা বলছি। কি স্নেহমাখা দৃষ্টি — স্নেহ যেন বিগলিত হয়ে পড়েছে। ঠাকুর ওখানে বসতেন। মাকে গান শোনাতেন। তাই মা জাগ্রত জীবন্ত। করুণাময়ী করুণা বিতরণ করছেন সংসারতপ্ত জীবদের অকাতরে।

একটি ভক্ত (স্বগত) — আহা, শ্রীম-র মন এখন মায়ের দিব্য স্নেহদৃষ্টিতে নিমগ্ন! শ্রীম-র দৃষ্টি তাই অন্তর্মুখ আর বাৎসল্য রসে তা সিঞ্চিত।

৩

মর্টনের ছাদ। এখন সন্ধ্যা সমাগত। শ্রীম চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসা বেধে সামনাসামনি শ্রীম-র সম্মুখে — ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও শুকলাল, বড় জিতেন, যতীন ও রমণী, বলাই ভৌমিক ও গদাধর, ছোট নলিনী ও জগবন্ধু প্রভৃতি। প্রজ্জ্বলিত হ্যারিকেন লণ্ঠন আসিতেই শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন। আধঘন্টা পর শ্রীম উঠিয়া গিয়া ছাদের উত্তর দিকের ‘তপোবনে’ পায়চারী করিতেছেন। ‘তপোবনে’ বড় বড় টবে ছোটবড় অনেক গাছ — ফল, পুষ্প ও তুলসীর।

বেলুড় মঠের সাধুদের প্রবেশ। তাঁহারা অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য, বিজয়ার প্রণাম করা। সাধুগণ ছাদে প্রবেশ করিতেই ভক্তগণ দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীমও সাধুদের দেখিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর

হইতেছেন। সাধুরা মধ্য রাত্জায় শ্রীম-র সহিত মিলিত হইলেন, জলের ট্যাঙ্ক ও লোহার সিঁড়ির মধ্যস্থলে। শ্রীম যুক্ত করে ‘নমস্কার, নমস্কার’ বাক্যে সাধুদের আবাহন করিলেন। অন্ধকারে এখনও সাধুদের চিনিতে পারিতেছেন না। তাই সাধুরা নিজের নাম বলিতেছেন।

আসিয়াছেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, আত্মবোধানন্দ ও অভয়ানন্দ। আর স্বামী দয়ানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ ও বিমুক্তানন্দ। সাধুরা জানেন, শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে দেন না। তাই তাঁহারা পূর্ব হইতে একটি সশ্রদ্ধ আনন্দময় ক্রীড়ার পরিকল্পনা করিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে আজকের দিনে সকলে শ্রীম-র চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন।

একজন প্রথমে অগ্রসর হইলেন পায়ে হাত দিতে। শ্রীম তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। এই ফাঁকে অপরে পায়ে হাত দিলেন। এই কৌশলে সকলে হরিলুটের মত ছড়াছড়ি করিয়া শ্রীম-র পায়ে হাত দিলেন। সাধুদের সশ্রদ্ধ প্রেমলীলারই জয় হইল। শ্রীম আজ স্নেহাস্পদদের নিকট পরাজিত। তিনি প্রসন্ন বদনে সাধুদের লইয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। শ্রীম বসিলেন নিজ কক্ষে প্রবেশ দরজার সম্মুখে, দক্ষিণাস্য। সাধুরা বসিলেন তাঁহার সম্মুখে উত্তরাস্য। সকলেই বেঞ্চে বসা।

শ্রীম অনেকদিন পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে নিকটে পাইয়া বড়ই আফ্লাদিত। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া আদর করিতেছেন, যেমন মা করেন। ইনি অতি অল্প বয়সে সাধু হন। শ্রীম-র মায়ের মত স্নেহোপদেশ তখন তাঁহাকে নানা ভাবে প্রচুর সহায়তা করে। এইজন্য উভয়ের মধ্যে সর্বদাই একটি দিব্য মধুর স্নেহবন্ধন রহিয়াছে। এবার আনন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি) — তোমরা বাঙ্গালোরেই ছিলে বরাবর? ভাল আছ?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — পরে নেট্রামপল্লী ছিলাম। এটা একটা গ্রাম্য আশ্রম, মাদ্রাজের কাছে। খুব ভক্ত লোক সব। আশ্রমটি যেন সমগ্র গ্রামের ঠাকুরবাড়ী। স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলেই নিত্য আসে যেমন দেবালয়ে গিয়ে থাকে।

তামিল ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হয়। কিন্তু শশীমহারাজ (স্বামী

রামকৃষ্ণানন্দ) তামিল ভাষা শেখেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তা হলে মেয়েদের সঙ্গে বেশী মিশতে হবে। তাই শেখেন নাই।

শ্রীম — পুরানো ভক্ত রামু, রামানুজ প্রভৃতি কেমন?

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — সকলেই ভাল। ওঁরাও ভাল আছেন। রামু শশীমহারাজের হাতে গড়া।

শ্রীম — শশীমহারাজ নিষ্ঠাভক্তির স্তম্ভস্বরূপ। নিজে সেবাকার্য করতেন। বরানগর মঠের সব কাজ নিজে করতেন। আলমবাজার মঠেও তাই। মাদ্রাজে গিয়েও তাই। নিজে করতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। কেউ সহায়তা করতে গেলে ভাল, না গেলেও ভাল। ‘অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ’ — গীতায় আছে (১২-১৬)। সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ সারা দিনরাত সেবায় মগ্ন। জীবন্ত সেবা! ঠাকুরের জীবিতাবস্থাতে যে ভাব নিয়ে করতেন, মহাসমাধির পরও ঐভাবে সেবা করতেন। কত কষ্ট! এই ক’রে ক’রে শরীরে ব্যাধি বাসা বাঁধে। উঃ, কত কর্ম! পাঁচটা লোক হিমসিম খেয়ে যেতো ওঁর সঙ্গে কাজ ক’রে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — বাইরের কাজ, মিশনের কাজও দিন দিন বাড়ছে। এত বেড়েছে যে এখন আর ধ্যানজপের অবসর মেলা কঠিন হয়ে পড়েছে। মিশনের কাজ শুরু করলেন স্বামীজী, ঠাকুরের অভিপ্রায় জেনে।

আচ্ছা মাস্টারমশায়, তা হলে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা reconciled (সামঞ্জস্য) হয় কি রকম করে? ঠাকুর বললেন, তাঁর চিন্তায় ডুবে যাও। স্বামীজী বললেন, কাজ কর।

শ্রীম (সঙ্গে সঙ্গে) — তবে গুরু-উপদিষ্ট কর্ম করবে চিত্তশুদ্ধির জন্য। আর একরকম কর্ম করেন, যেমন অবতারাদি সিদ্ধ অবস্থায়, তাঁর দর্শনের পর। এই কর্ম লোকশিক্ষার জন্য করেন। আর তা না হলে গুরু যা বলেন তাই করা।

গুরুর বাক্যে বিশ্বাস চাই। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে ছাই হবে, ঠাকুর বলতেন। গুরুকে দেখতে হবে, যেন ঈশ্বর এই মুখে কথা কইছেন। এইসব ঠাকুরের মহাবাক্য!

তা না হলে, ঠাকুর বলতেন, গুরু করবে না। এ তো আর ব্যবসা

নয়। তিনি বলতেন, দিনে রেতে তাঁকে দেখবে, তবে গুরুপদে বরণ করবে। তা না হলে, এখন যে শ্রদ্ধা একটু পরই তা অশ্রদ্ধা হয়। তাই ফস্ করে গুরু করতে নাই।

৪

শ্রীম কি স্মরণ করিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — এমন আছে, গুরু যদি অন্যায় বলেন, তা-ও করতে হবে। ঠাকুর একটি গল্প করতেন।

এক গুরুর একটি বিধবা শিষ্যা ছিল। গুরুর ছেলের পৈতে হবে। শিষ্যরা কে কি দিবে তার ফর্দ হলো। লোক খাওয়ান হবে কি না! শিষ্যা বললে, আমি দই দেব। উৎসবের দিন দুশো লোক খাবে। শিষ্যা খুব গরীব কিন্তু অতি সরল আর গুরুভক্ত। সে ঐদিন হাতে একটি ভাঁড়ে একটু দই নিয়ে উপস্থিত। প্রণাম করে আনন্দে বললো, এই দই গুরুদেব! গুরু রেগে শিষ্যাকে বললেন, তুই নদীতে গিয়ে ডুবে মর। আমাকে কলঙ্ক দিলি! অত লোক খাবে, আর এইটুকু দই! বলেই লাথি মেরে ভাঁড়টা ভেঙ্গে ফেললো। শিষ্যা গুরুর ক্রোধ অপনোদনের জন্য কাঁদতে লাগলো। আর নদীতে গিয়ে জলে নেবে ডুবতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ডোবা হলো না। সারা নদীতে কোমর জল। তখন উঁচৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো — হায়, আমার গুরুবাক্য রক্ষা হলো না।

ভগবান তখন দর্শন দিয়ে একটি দইয়ের ভাঁড় দিলেন ঠিক শিষ্যার ভাঁড়ের মত। বললেন, যা এটা নিয়ে যা। যত ঢালবে তত পড়বে। বলেই উল্টিয়ে ধরে রাখলেন। আর দইয়ে নদী ভরে গেল। শিষ্যা অতি আনন্দে হাসতে হাসতে গিয়ে গুরুর হাতে ওটা দিলে। গুরু আবার রেগে গেল। সে তখন ভাঁড়টা উল্টিয়ে ধরলো। আর দইয়ে সারা অঙ্গন ভরে গেল। গুরু কন্যাপ্রতিম শিষ্যাকে বক্ষে ধারণ করে কেঁদে কেঁদে বললে — মা, যিনি তোকে এটা দিয়েছেন তাঁকে একবারটি আমায় দেখাতে হবে। শিষ্যা অতি আনন্দে ‘হাঁ’ বলে, গুরুকে নিয়ে নদীতীরে চলে গেল। পড়ে রইল ছেলের পৈতে আর লোক খাওয়ান।

শিষ্যা ডাকতেই ভগবান উপস্থিত। সে বললো — ঠাকুর, আমার গুরুদেবকে একটিবার দর্শন দিন। ভগবান বললেন — তা হয় না, মা।

তোর শেষ জন্ম। আর এর এই প্রথম জন্ম। খুব কান্নাকাটি করায় তখন একবার গুরুকে দর্শন দিলেন। এই গল্পটির দ্বারা ঠাকুর বোঝাচ্ছেন, গুরু যা বলেন তা করতে হয় অন্যায় হলেও, আর গুরুতে মানুষবুদ্দি করতে নাই। ঈশ্বরবুদ্দি করতে হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — আচ্ছা, এটা কি একবারেই হয়, না ক্রমে ক্রমে হয়?

শ্রীম — ক্রমে ক্রমে। অভ্যাস করতে হয়। ‘অভ্যাসেন তু কৌশ্বেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে!’ (গীতা ৬-৩৫)।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — একদিন দুপুরের সময় একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, উপায় কি? তৎক্ষণাৎ ready answer (উত্তর প্রস্তুত) — ‘গুরুবাক্যে বিশ্বাস।’

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — আচ্ছা মাস্টারমশায়, মনে এমন সব ভাব ওঠে যা ওঠা উচিত নয়। আমরা ঠাকুরকে ধরেছি। এমন ঠাকুর, তবুও কেন আমাদের মনে এমন সব ভাব উঠবে? তিনি কেন আমাদের দেন না এমন শক্তি যাতে এসব না ওঠে মনে?

যেমন শুনেছি, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাদের বলতেন, আমার এক একটা ঐরূপ ভাব উঠত। আর ঠাকুর ছুঁয়ে দিতেন। অমনি ঐ ভাব চলে যেতো। তিনমাস আর ঐ ভাব উঠতো না। ঐ কথা স্মরণ থাকতো না। এমন শক্তি আমাদের কেন দেন না ঠাকুর? আমরা তো তাঁর কাছে ঐ চাই।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — আপনারা ঠাকুরকে এখন দেখেন কি?

শ্রীম — ও কথা যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে নেই। কারণ, বললেই বিশ্বাস হয় না। ঠাকুর বলতেন, বিশ্বাসেরও আবার ডিগ্রি আছে। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ওসব কথা বললেও বিশ্বাস করে না। তাই গুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — আপনাদের জিজ্ঞাসা করব না তো কার কাছে যাব—আপনি মহাপুরুষ! ঠাকুরের ছেলেদের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। আমাদের দ্বারা আর কিছু হবে না। এখন আপনারা যদি কিছু করে দেন।

শ্রীম — ব্যাকুলতা হলে আর বাকী কি রইল — the last step in the ladder. তারপরই ছাদ।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — তাও তো নেই, ব্যাকুলতা নেই। মন যেন কি রকম একটা tangible some thing (জীবন্ত আশ্রয়) ঠাকুরের কাছ থেকে চাইছে। তা নইলে আমরা আর পারছি না।

শ্রীম — কাঁচা অবস্থায় বোঝা যায় না। ঘুমন্ত লোক — গাড়ী চলে গেছে কাশী — ঘুম ভাঙ্গলে বলছে, আমি হাওড়া স্টেশনেই রয়েছি। তুমি বুঝতে পারছ না কোথায় আছ।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — যাই বলুন মাস্টারমশায়, tangible কিছু না পেলে আর চলছে না। বিশ্বাস দাঁড়াবার আধারটি চাই। হাতে নাতে না পেলে কিছু হচ্ছে না।

শ্রীম — স্বামীজীকে বলেছিলেন, চাবি আমার কাছে রইল। কাজ কর। তারপর খুলে দেব। একটু খাদ না থাকলে কাজ হয় না, তাই।

মানুষ খালি complain (অনুযোগ) করে। কিন্তু দেখছে না কত করুণা, কত পেয়েছে! প্রথম, মনুষ্যত্ব আর মুমুকুত্ব। তারপর মহাপুরুষ সংশ্রয়। আবার ভারতে জন্ম। তার ওপর এই সময়ে জন্ম — গরম গরম — একেবারে অবতার। এই সেদিন চলে গেলেন। তাঁর সময়ের প্রায় সকলেই রয়েছেন।

সুবিধাগুলো দেখবে না। খালি অসন্তোষে তো হবে না, সন্তোষ চাই। তাঁর সময়কার সাধুরা রয়েছেন। কত সুবিধা!

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — আচ্ছা, এখনও কি ঠাকুরকে দেখেন?

শ্রীম — শুনতে পেতাম, কেউ কেউ কখনও দেখতে পেয়েছেন। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন।

স্বামী আত্মবোধানন্দ — আপনার ঐ গল্পটি খুব ভাল — বাইবেলের মার্থা ও মেরি — এই দুই ভগ্নীর।

শ্রীম — হাঁ। বলরামবাবুর বাড়িতে বলেছিলাম।

শ্রীম (স্বগত) — Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. (St. Luke 10-41).

But one thing is needful : and Mary hath chosen

that good part, which shall not be taken away from her. (St. Luke 10-42).

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — মার্থা, মেরি দু'বোন। তাদের বাড়িতে ক্রাইস্ট গেছেন। মার্থা তখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মেরি, ক্রাইস্টের কাছে বসে আছে আর একদৃষ্টিতে দেখছে। গৃহকর্মে মার্থা সহায়তা চাইছে। মেরির কানে ঢুকছে না ঐ কথা। মার্থা ক্রাইস্টের নিকট অভিযোগ করলো। ক্রাইস্ট তখন বললেন এই কথা — মার্থা, তুমি নানা কাজে নানানখানায় জড়িত হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের জীবনে একটি জিনিসের দরকার। সেটি মেরি লাভ করেছে। এটি কেউ কখনও অপহরণ করতে পারবে না।

সেই 'one thing' হচ্ছে ঈশ্বরে প্রেম। ওদের (ক্রিষ্টিয়ানদের) কর্মযোগ আছে কিনা। ক্রাইস্ট বললেন, তা থেকে 'প্রেম' ভাল।

এবার সাধুগণ মিস্তিমুখ করিবেন। রসগোল্লা, সন্দেশ ও সিঙ্গাড়া আসিয়াছে। ভক্তগণ হাত ধুইতেছেন। আর শ্রীম নিজ হাতে মিস্তিন্ন দিতেছেন, এই স্থূলশরীরের আহার। আবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কথাও বলিতেছেন — কারণশরীরের আহার।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — বরানগর মঠে নেচে নেচে হতো এই গানটি (শ্রীম গাহিতেছেন) —

চল গুরু দু'জন যাই পারে, আমার একলা যেতে ভয় করে।

এ দেহ ছিল শ্মশানের সমান,

গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুলবাগান।

তার সৌরভেতে আকুল করে মুনিঋষির মন হরে।।

গুরু-বই উপায় নেই। যখনই গোলমালে পড়া যায়, তখনই শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — আমাদের অপরাধ হচ্ছে — এঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন এখানে।

স্বামী দয়ানন্দ — চলুন, আমরা ঘরে গিয়ে বসি। (শ্রীম-র প্রতি) আপনি বসুন।

শ্রীম — তা কি হয়? আপনারা না বসলে কি আমরা বসতে পারি? আপনাদের দর্শন করে এদের আহ্লাদ হয়েছে। তাই দাঁড়িয়ে দর্শন করছেন।

সব young এঁরা। কষ্ট কোথায় — এ যে লাভ সবটাই!

বলে, সাধু দর্শন করলে কর্ম কমে যায়। কমে যায় কেন, নিশ্চয় কমে যায়। সাধুরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরে এসে। এতেও কষ্ট! কত কৃপা তাঁর — ঘরে সাধু এসে দর্শন দেন!

এমন দেশ! রাস্তা দিয়ে সাধু যায় আর দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে লোকে দেখে। এ জিনিস আর কোথাও পাওয়া যায় না।

সাধু ভগবানের রূপ। সাধুসেবা সাধুসঙ্গ করলে ভগবানের সেবা করা হয়। সাধুদর্শন করলে ভগবানের সেবা করা হয়। সাধুর ভেতর তাঁর প্রকাশ বেশী কিনা। তাই এঁরা সব দাঁড়িয়ে থেকে দর্শন করছেন।

সাধুরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রাত্রি নয়টা। ভক্তরাও অনেকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীম ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, সর্দি হইয়াছে। অন্তেবাসী, বিনয় প্রভৃতি পাশে বেঞ্চে বসিয়া আছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আচ্ছা, জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের) বয়স কত হবে?

অন্তেবাসী — প্রায় চল্লিশ হবে।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — বলো কি! তাহলে তো বড় অন্যায় হলো। অমন করে বলা হলো। আমি মনে করে বসে আছি সেই বিশ বাইশ বছরের ছেলোটি। কত তপস্যা করেছে বাঙ্গালোর মায়াবতী — কত স্থানে। আমাদের apology (ক্ষমা) চাওয়া উচিত। কাল সকালে আপনি যান অদ্বৈতাশ্রমে। হাত জোড় করে বলবেন, তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন apology (ক্ষমা) চাইতে। বলবেন, তিনি কিন্তু মনে করেছিলেন সেই কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলোটি, সেই জিতেন। প্রথম প্রথম এখানে আসাযাওয়া করতো কিনা। সেই কথাই মনে আছে।

কলিকাতা, পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতি ভবন।

৭, শংকর ঘোষ লেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল,
দেবীপক্ষ, শুক্লাদ্বাদশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহরণ*

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের সভাগৃহ। অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা। জ্যৈষ্ঠ মাস, খুব গরম পড়িয়াছে। শ্রীম মাদুরে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। তাঁহার সম্মুখে ও দুই পাশে ভক্তগণ বসা — ডাক্তার বক্সী, বিনয় ও সুখেন্দু, অমৃত, যোগেন ও উকীল ললিত ব্যানার্জী, শান্তি ও রাখাল, শুকলাল ও মনোরঞ্জন, এটর্নি বীরেন বোস ও জগবন্ধু প্রভৃতি।

শ্রীম সাতদিন হয় মিহিজাম হইতে ফিরিয়াছেন। কয়েকমাস সেখানে থাকার ফলে স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছিল। কলিকাতার জলবায়ুতে এই কয়দিনের মধ্যেই শরীর খারাপ হইয়াছে। খুব সর্দি হইয়াছে। তাহার উপর গ্রীষ্মের দারুণ গরম। কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে।

আজ ১৭ই মে, ১৯২৩ খ্রীঃ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার।
 ʼজয়রামবাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানের উপর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মায়ের প্রধান সেবক স্বামী সারদানন্দজীর চেষ্ঠায়। দেওঘর বিদ্যাপীঠের স্বামী দেবাত্মানন্দ, ঐ মন্দিরের প্ল্যান ও উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমকে পাঠাইয়াছেন। মন্দিরের প্ল্যান দেখিবার জন্য ভক্তদের খুব আগ্রহ। কিন্তু প্রশান্তগভীর শ্রীম-র আগ্রহ আজ অতি অত্যন্ত। মাতৃদর্শনার্থী বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া শ্রীম মন্দিরের প্ল্যানটি ভক্তদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া অতি আনন্দে ও ওৎসুক্যে উহা দেখিতে লাগিলেন। শ্রীম-র দেখা আর শেষ হয় না। মনে হয়, তিনি যেন মাকে জীবন্ত দর্শন করিতেছেন ঐ মন্দিরে। মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত।

*আহরণ - অনিবার্য কারণে 'আহরণে' সময়ের পারস্পর্য (Chronology) ব্যাহত।
 'আহরণ' এই গ্রন্থে আগম্ভক।

উৎসবের বিবরণ কয়েকবার পাঠ হইল। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক ব্রহ্মচারী পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ মায়ের ভাবে ভরপুর। যে সন্ন্যাস চাহিয়াছে তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছেন অকাতরে। কৃপার যেন বন্যা!

শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, ধন্য যাঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন! কি দিন! জগদম্বার নবরূপে আগমন জগতের কল্যাণের জন্য। এই প্রতিষ্ঠার মানে এই — সংসারতপ্ত ভক্তগণের একটি জুড়াবার স্থান হল — সেখানে মায়ের নিত্য আবির্ভাব থাকবে। যে যাবে সে-ই মায়ের দিব্য স্নেহপীযুষ পানে ধন্য হবে বহুকাল। এটি জগদম্বার নূতন পীঠ। মা-ই তাঁর অবিদ্যামায়ায় জীবগণকে জগতে বদ্ধ করেন। আবার তিনিই মুক্তির সন্ধান বলে দেন বিদ্যামায়ারূপে। জগদম্বার নূতন পীঠ জয়রামবাটি।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে কিছুক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর আর একটি পত্রের পাঠ শুনিলেন। এইটিও একজন সাধু লিখিয়াছেন আলমোড়া হইতে। লিখিয়াছেন, আশীর্বাদ করিবেন যেন এই জীবনেই ঈশ্বরদর্শন হয়। এত আয়োজন এখন। আপনারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ রহিয়াছেন। এবার যেন জন্মটা সফল হয় ঠাকুরের কৃপায় আর আপনাদের আশীর্বাদে

শ্রীম বলিলেন, দেখ কি ব্যাকুলতা! যেন এই জীবনেই ঈশ্বরদর্শন হয়। ঠাকুর এসে এই ব্যাকুলতার বরনা খুলে দিয়েছেন। নইলে এসব দেখা যায় না। সাধু, তীর্থ, তপস্যা সবই চিরকাল আছে। কিন্তু ব্যাকুলতা নাই। এটি হয় অবতার এলে। ঠাকুর এইমাত্র এসেছেন অবতার হয়ে। তাই এসব কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। অবতার না এলে তখন ঐ গীতার কথা (৬-৪৫) — ‘অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্’। তখন হবে হচ্ছে করে। এই জন্মেই চাই, এই ক্ষণে চাই —এ হয়েছে ঠাকুর এসেছেন বলে।

এইবার গান হইতেছে। ব্রহ্মচারী রমেশ গাহিতেছেন রামকৃষ্ণ বন্দনা — ‘গাও রে জয় জয় রামকৃষ্ণনাম’।

সকলে গাহিলেন —

এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।

বিবেক বৈরাগ্য বুলি তাঁর দু কাঁধে সদা বুলে ॥

শ্রীম এই দ্বিতলের গৃহে বসিয়াই ভক্তদের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, ও কারো কারো হয়। হবে না কেন? কিন্তু আমার ও পথে যাবার যো নেই। মা আমায় এমন অবস্থায় রেখেছেন। আমি কেবল শুদ্ধাভক্তি চাই, আর কিছু না। সিদ্ধাই — রোগ সারান, দেয়াল থেকে পেঁড়া বের করা, হেঁটে গঙ্গা পার হওয়া — এসব তিনি চাইতেন না। বলতেন, রোগ সারানোর জন্য ঈশ্বর ডাক্তার কবরেজ করেছেন। জীবনধারণের জন্য তিনি অগ্নি ও জল, সূর্য ও বর্ষা, চন্দ্র ও শস্য, বায়ু ইত্যাদি কত কি করে রেখেছেন পূর্ব থেকে। আবার মাতৃপেটে স্থান, মাতৃস্তনে দুগ্ধ, মাতাপিতার স্নেহ! ওষধি বনস্পতি, commerce, agriculture (কৃষি বাণিজ্য) সারা বিশ্বটাই জীবের রক্ষার জন্য করে রেখেছেন।

ওগুলির জন্য আবার কেন তাঁকে বলা? লাউ কুমড়া কেন তাঁর কাছে চাওয়া? আর সংসারে থাকতে গেলে ওগুলি — রোগ শোক, দুঃখ, বিবাদবিসম্বাদ থাকবেই। তাই চাইতে হয় তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি। ক্রাইস্ট তাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, 'these things' — অর্থাৎ সাংসারিক জিনিস তাঁর কাছে চায় যারা হীন থাকের লোক। ঠাকুরও ঐ তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেছিলেন, 'ই-গুলোর জন্য ভেবো না — অর্থাৎ সাংসারিক জিনিসের জন্য। তাঁর কাছে চাও কেবল ভক্তি।

জগবন্ধু — ঠাকুর কাকে বলতেন, এসব কথা?

শ্রীম — এই যারা সর্বদা যেতো, সর্বদা কাছে থাকতো তাদের জন্য বলেছিলেন — অন্তরঙ্গদের জন্য।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মানুষশরীর ধারণ করে ঈশ্বর, ঠাকুর আমাদের কাছে এসেছেন। ঠিক আমাদের মত হয়ে, রোগ শোক দুঃখ কষ্ট সব নিয়ে। তবে তো মানুষ তাঁকে ধরতে পারবে, তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে পারবে। মানুষশরীরে ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ। তাই মানুষশরীর ধারণ। তাঁকে ভালবাসলেই সব হয়ে গেল। স্বরূপে তাঁকে ধরা অতি কঠিন। এই শিক্ষাটি আমরা লাভ করলাম মিহিজামের মাঠে। রাখালরা ছাগলদের তাদের ডাকে ডাকতো — 'বুরুরুর বুরুরুর' করে। ঐটে দেখে বুঝলুম ঈশ্বর

কেন মানুষ হয়ে আসেন — মানুষের ভাষা, মানুষের আচরণ নিয়ে।
নইলে যে বুঝতে পারবে না।

ঠাকুরের রোগ শোক দারিদ্র্য সব ছিল। আবার দিবানিশি ঈশ্বরে মন
নিমগ্ন। মানুষ তবে বুঝতে পারবে — তাঁরই যখন এসব হয়েছে, আমাদের
হবে এতে আশ্চর্য কি! তা হলেই ঐসব দুঃখাদির সময় ভরসা পাবে,
ঈশ্বরকে ডাকবে।

ক্রাইস্ট ভক্তদের বলেছিলেন, তোমরা আনন্দ কর। কারণ আমি
সংসার জয় করেছি। তোমরাও তাই করতে পারবে, কারণ আমি তোমাদের
ভার নিয়েছি। 'In the world ye shall have tribulation : but
be of good cheer; I have overcome the world.' (St. John
16-33).

ঠাকুরও বলেছেন, 'আমায় ধর, আমি সব করে দিব।' অবতারশরীর
নিয়ে এসে এসব অভয় দিয়ে গেছেন ভক্তদের।

শ্রীকৃষ্ণও তাই বলেছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৮ -৬৬) —
আমি তোমাদের মুক্তি দেব। মানুষশরীর ধারণের secret (রহস্য) এই
— মানুষকে, ভক্তকে অভয় দেওয়া।

২

আজ ২ হুশ জুন ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বিকালে শ্রীম চারতলার
ছাদে বসিয়া আছেন। তাঁহার সামনে বসা ভক্তগণ — শুকলাল, বড়
জিতেন, ছোট নলিনী, সুধীর, জগবন্ধু প্রভৃতি। বেলুড় মঠ হইতে
ঈশানস্কলার ব্রহ্মচারী ধীরেন ও বুড়ো হরিদা (স্বামী গৌরবানন্দ)
আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আর দুইজন ভক্তও আসিয়াছেন। সাধুরা
ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম ইহাতে ব্যস্ত হইয়াছেন।
'না, না। ওরকম করতে নেই', বলিয়া তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন।
শ্রীম-র আদেশে ভক্তগণ সাধুদের প্রণাম করিতেছেন। সাধুদের নিকট
মঠের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তাঁহারা মিস্ত্রিমুখ করিয়া মঠে রওনা
হইলেন। শ্রীম-র ইঙ্গিতে অন্তবাসী সাধুদের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গেলেন।

হৃদয় মুখার্জির জ্ঞাতি নলিনীবাবু আসিয়াছেন। একটু পর আসিলেন

যশোহরের একজন গ্র্যাজুয়েট। শ্রীম অন্তবাসীকে বলিলেন সকলকে লইয়া গিয়া দ্বিতলের সভাগৃহে বসিতে। তিনি উপরে আসিলেন। সন্ধ্যার আলো আসিতেই ‘হরিবোল হরিবোল’ বলিতে বলিতে শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন ভক্তসঙ্গে। শ্রীম-র কথায় একজন ভক্ত চারতলার ঘর হইতে দেবী পুরাণ আনিয়াছেন। আর তিনতলা হইতে শ্রীম-র পৌত্রের এত্নাজখানা আনিলেন। আটটার সময় একটি ভক্তকে বলিলেন, উঠুন, পড়ুন গিয়ে — পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। ভক্ত চলিয়া গেলেন।

পরের দিন গঙ্গা দশহরা। অনেক ভক্ত আজ বারে বারে আসিয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম দ্বিতলের বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন মাদুরে পূর্বাস্য। নিত্যকার ভক্তগণও আসিয়াছেন — শুকলাল, ছোট জিতেন, সুধীর, সুখেন্দু, রমণী, সঙ্গী যুবক, উকীল ললিত ব্যানার্জী, ভাটপাড়ার বড় ললিত। আজ তিনজন নূতন ভক্ত আসিয়াছেন। বিনয় গিয়াছেন স্টুডেন্টস্ হোমে আর ডাক্তার বঙ্গী কালীঘাটে।

শ্রীম-র কথায় বড় ললিত প্রথমে বাল্মীকিকৃত সমগ্র গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিলেন, পরে সমগ্র রামস্তোত্র, জটায়ুকৃত।

গঙ্গাস্তোত্র : — মাতঃ শৈলসুতা-সপত্তি বসুধা-শৃঙ্গারহরাবলি।

স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথিং প্রার্থয়ে।

রামস্তোত্র : —

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং, সকলজগৎ স্থিতিসংযমাদিহেতুং।

উপরমপরমং পরাত্নভূতং, সততম্ প্রণতোহস্মি রামচন্দ্রং ॥

শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছেন — স্থির নিশ্চল। পাঠ সমাপ্ত হইলে ভক্তমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যোগবাশিষ্ঠে আছে শরভঙ্গ ঋষি একটি কুটির বসে ‘রাম রাম’ জপ করছেন। শবরী আর এক কুটিরে বসে ‘রাম রাম’ করছেন। তিনি ব্যাধকন্যা। অনেক দিন সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করেছেন। তাই ঋষিদের মত তিনিও ‘রাম রাম’ জপ করছেন।

বনবাসের সময় রাম লক্ষ্মণ যখন তাঁদের কাছে এলেন তখন উভয়ে বললেন, রাম তুমি দাঁড়াও। তোমার সম্মুখেই এই বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করি।

এই সব কাহিনী ভারতের সনাতন ইতিহাস। শরীরধারণ ভগবানদর্শনের জন্য। তা হয়ে গেলে কেন আর শরীরের ভার বহন করা? উভয়ে অগ্নি প্রবেশ করলেন।

জ্ঞানলাভের পর শরীর ত্যাগ করা যায়। এতে আত্মহত্যা হয় না। ঐন্ডেদহের একটি যুবক আর বরানগরের গোপাল, ঠাকুরকে দর্শন করে শরীর ত্যাগ করেন। কেহ কেহ আত্মহত্যার দোষ আরোপ করলে ঠাকুর তার খণ্ডন করলেন। বললেন, না এটা আত্মহত্যা নয়। জ্ঞানলাভের পর এতে দোষ নেই। মানে ঠাকুরই তো ভগবান, তাঁকে দর্শন প্রণাম ও তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে শরীর ত্যাগ করেছেন। তাই দোষের নয়। জাবাল-উপনিষদেও আছে, জ্ঞানলাভের পর শরীর ত্যাগ করলে আত্মহত্যা হয় না — ‘বীরাধ্বনে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নিপ্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা।’

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা গান করুন। আমি ওপর থেকে খেয়ে আসি।

ভক্তগণ সকলে সমস্বরে গাহিলেন প্রথমে ঠাকুরের আরতি — ‘খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্ধন বন্দি তোমায়’, ইত্যাদি। তারপর স্তব — ‘ওঁ হ্রীং ঋতম্’। তারপর রমণীর নেতৃত্বে সকলে গাহিলেন —

গান। নাথ তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার ॥

গান। যতনে হৃদয়ে রেখে আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুই দেখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥

মর্টন স্কুলের পুরাতন শিক্ষক মহেন্দ্রবাবু এখন সাধু। তাঁহার নাম দ্বারকাদাস বাবাজী। তিনি আজ হরিদ্বার হইতে আসিয়াছেন। তিনিও ভজনে যোগদান করিলেন। তিনি শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। শ্রীম আসিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

এখন রাত্রি নয়টা।

আজ শনিবার। ২১শে জুলাই, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। অপরাহ্নে শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন। একজন সাহেবও আসিলেন। শ্রীম-র শরীর অসুস্থ

থাকায় বিশেষ কিছু কথা হয় নাই। শ্রীম সাহেবকে বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এই শরীরে এসেছেন অর্থাৎ তিনি অবতার। আর বলেছিলেন ক্রাইস্টের মত — ‘আমায় ধর। আমি সব করে দিব।’

সন্ধ্যার পর আজও ভক্তরা গান গাহিলেন। আটটায় সভাভঙ্গ হইল। ভক্তরা কেহ কেহ ডাক্তারের বাড়িতে কাশীপুরে গেলেন।

পরদিন রবিবার। সকালে ছোট অমূল্য বিনয় ও জগবন্ধু মঠ দর্শন করিলেন। অপরাহ্নে তাঁহার কাশীপুর শ্মশান দর্শন করিলেন। এখানে ঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ অগ্নিস্যাৎ হয়। সেই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র বেদী নির্মিত হইয়াছে। তারপর ভক্তগণ কাশীপুর উদ্যান দর্শন করেন। অসুস্থ হইয়া এখানে ঠাকুর দশ মাস ছিলেন। এখানেই ঠাকুর মহাসমাধি লাভ করেন। এখন এখানে একজন আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান ভক্ত বাস করেন। তিনি দয়া করিয়া ঠাকুরের ঘর ও বাগান দর্শন করিতে অনুমতি দেন। সন্ধ্যার পর ভক্তরা ডাক্তার বঙ্কীর গাড়ীতে কাশীপুর হইতে মর্টন স্কুলে আসিলেন।

শ্রীম ভক্তদের নিকট হইতে মঠ, কাশীপুর শ্মশান ও কাশীপুর উদ্যানের সংবাদ লইলেন। বলিলেন, এই উদ্যানে ঠাকুরের ভাব জীবন্ত। মঠের হাতে এলে ভাল হয়, এই স্থানটি। এখানে তিনি নিজেকে স্পষ্ট করে প্রচার করেছেন। বলেছেন, অন্তরেও সচ্চিদানন্দ বাইরেও সচ্চিদানন্দ দেখছি। আর দেখছি, ঐ সচ্চিদানন্দ একটা চামড়া দিয়ে ঢাকা। একপাশে একটা ঘা। বলেছিলেন, এখন দ্বৈতভাব দূর হয়ে গেছে। মা আর ছেলে নাই, সবই মা, সচ্চিদানন্দ। বলেছিলেন, জড় নাই, সব চৈতন্য। হাড় মাস সব চৈতন্য। সব ভেদ দূর হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ সবই ব্রহ্ম।

মাখন হোড়ের প্রবেশ, সঙ্গে কুলগুরু। ইনি তর্কপঞ্চানন উপাধিধারী আর ব্রাহ্মণ সমাজের সম্পাদক। ইনি ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়িয়াছেন। শ্রীম আজ বেশী কথা কহিতে সমর্থ নহেন সর্দির জন্য। তাই গান গাহিতে বলিলেন। মাখন ও অন্য একজন ভক্ত এক একটি করিয়া শিবের গান করিলেন। ডাক্তার কার্তিক বঙ্কী গাহিলেন, ‘বাজিছে শ্যামের মোহন বেণু’।

গান সমাপ্ত হইল। শ্রীম এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন স্বামীজী দু'টি গান গাইলেন দক্ষিণেশ্বরে। একটি — ‘চিন্তয় মম মানসহরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন’। অপরটি — ‘সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে’। তারপর স্বামীজী উঠে চলে গেলেন। এদিকে ঠাকুরের ভাব সমাধি হয়েছে। নিচে নেমে এসে ঠাকুর বলছেন, আশুন জ্বালিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। ‘আশুন জ্বালিয়ে’ মানে ঈশ্বরীয় ভাব উদ্দীপন। আহা কি কণ্ঠ স্বামীজীর! যেন গন্ধর্ব কণ্ঠ। মন স্থির হয়ে যায়। আর ঠাকুরেরও সমাধি হয়ে যেতো।

পরের দিনও মাখন হোড় আসিয়াছেন। দ্বিতলের ঘরে ভক্তসভা। শ্রীম মাদুরে বসা। মাখন তাঁহার কুলগুরু তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কথা পাড়িলেন। গতকাল তাঁহাকে মাখন শ্রীম-র নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। বলিলেন, উনি মঠে গিছিলেন। ঠাকুরকে মানেন। কথামৃত ও স্বামীজীর বই পড়ে ব্রাহ্মণ সমাজের সম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

মাখন আবার বলিলেন, আমি কালী মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দের) কাছে গিছলাম। তাঁর কাজ করার ইচ্ছা কলকাতায়। বললেন, এখানে আশ্রম করতে হবে। আর বললেন, কর্মী পেলে টাকা বের করবেন।

এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। ওঠা যাক্, বলিয়া শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তগণও উঠিলেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, অতগুলি প্রতিষ্ঠান হওয়া ভাল না, পৃথক পৃথক — বেদান্ত সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ইত্যাদি। একটার ব্রাঞ্চ হলে বেশ ভাল হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় বলিলেন, কতরকম প্রকৃতি করেছেন ঈশ্বর। সকলেরই আহার তিনি জুটান। ঠাকুরই তো ঈশ্বর। তাই তিনি সকলের নিকট যেতেন। কারকে বাদ দিতেন না।

৩

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সময় হলেই সব হয়। অসময়ে করতে গেলেই যত বিপদ। কচি অবস্থায় আমের খোসা ফেলে দিলে কি হয়? ভেতরে শাঁস হবে, বিচি হবে, বড় হবে, পাকবে। তখন খোসা ফেল, দোষ নেই। মানে, unprepared (অপ্রস্তুত) অবস্থায় কোনও কিছু করলে সেটা স্বভাববিরুদ্ধ হয়। প্রত্যেক জিনিসই — natural way-তে (স্বাভাবিক

পথে) যাওয়া ভাল। হঠাৎ সন্ন্যাসাদি নেওয়া ভাল নয়। ভেতরে পাকলে তখন ছাড়লে দোষ নেই।

ঠাকুর বলতেন, সন্ন্যাস অনেক রকম আছে। এক রকম, সংসারের জ্বালায় জ্বলে বের হয়ে আসা। আর একরকম সন্ন্যাস শোকে-টোকে হয়। আর একরকম, বাল্যকাল থেকেই সন্ন্যাস। আসল সন্ন্যাস হলে, একেবারে নির্জনে গিয়ে থাকে।

আজ শ্রীনাগপঞ্চমী তিথি। ইহা শ্রীম-র জন্মতিথি। মঠের জ্ঞানমহারাজ অনেকদিন হইতে ভক্তদের বলিতেছেন, শ্রীম-র শরীর থাকতেই জন্মাৎসব আরম্ভ করা উচিত। ভক্তরা তাই শ্রীমকে না জানাইয়া এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। উৎসবস্থলী — কাশীপুর, ডাক্তার বক্ষীর গৃহ। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভোগরাগাদির প্রচুর আয়োজন। মঠের সাধুরাও কেহ কেহ সাহায্য করিয়াছেন। জ্ঞান মহারাজ কয়েকজন সাধু ও ব্রহ্মচারী সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন।

সকাল হইতে ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য ও মনোরঞ্জন কাজ করিতেছেন। দুপুরে আসিলেন ছোট নলিনী। চারিটার পর আসিলেন অশ্ববাসী, স্কুলের ছুটির পর। শ্রীম ততক্ষণে সব জানিয়াছেন। তাই রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত ভক্তদের বসাইয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, ছোট অমূল্য, মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু প্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন। শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিরিঞ্চি, নায়েব, সুধীর, অমৃত, গদাধর প্রভৃতি বসিয়া প্রচুর প্রসাদ পাইলেন। শ্রীমও পাইলেন, কিন্তু অল্প। আনন্দে সকলে জয়গান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আজকাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসব চলিতেছে। শ্রীম অশ্ববাসীকে বলিলেন, আজ ওখানে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবমিলন’-এর আলোচনা হবে। আমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ আছে। আপনি যান। ওঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। (কথামৃত দেখাইয়া) প্রথমে নৌকাবিহার। এ দু’টো অধ্যায় (২য় খণ্ড — তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ) পাঠ করবেন। এখানে ঠাকুর বলছেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। আর, ব্রহ্ম ও কালী অভেদ। আর দ্বিতীয় ভাগের এখানটা, (দশম খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ, কমল কুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ) পাঠ

করবেন। তারপর ঐ বিষয়ে আলোচনা করবেন — শক্তি ব্রহ্ম অভেদ, ব্রহ্মই মা।

অন্তেবাসীর সঙ্কোচ হইতেছে। তিনি নব যুবক, আর আচার্যগণ প্রবীণ ও বহুদর্শী ভক্ত। তাহার উপর আবার গত সপ্তাহ জ্বরে শয্যাগত ছিলেন। আজই উঠিয়াছেন।

শ্রীম বলিলেন, ঠাকুরই ভক্তের হৃদয়ে থেকে কথা ক'ন। সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। যান, তিনি শক্তি দেবেন। গুঁরা সাধুলোক। ঠাকুরকে বহুবার দর্শন করেছেন। তাঁর ভালবাসা পেয়েছেন। প্রমথবাবু কুমার ব্রহ্মচারী। ঠাকুরের কথা বলতে সঙ্কোচ করতে নেই। আমরা যে তাঁর কথা বলি, তা তিনিই কণ্ঠে বসে কথা ক'ন। আমাদের কথা নয় এসব। সব তাঁর কথা। যান, তিনি আপনার মুখ দিয়ে কথা কইবেন।

অন্তেবাসী রওনা হইলেন নববিধানে। শ্রীম সঙ্গে পাঠাইলেন শচী ও ছোট নলিনীকে। একে একে সকল ভক্তগণ আসিলেন। সকলের শেষে আসিলেন শ্রীম। কেশববাবুর ভ্রাতৃপুত্র আচার্য নন্দবাবু আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রমথবাবু প্রভৃতিও শেষে যোগদান করিলেন। শ্রীম-র কথামত অন্তেবাসী প্রথমে কথামৃতের চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলেন। তারপর শক্তি ব্রহ্ম অভেদ, ব্রহ্মই মা — এ বিষয়ে তিনি আধ ঘণ্টার বেশী বলিলেন। এখন তাঁহার সঙ্কোচ নাই। আছে আনন্দ। তিনি বুঝিলেন, সত্যই কে যেন ভিতর হইতে বলিতেছেন।

৮ ই ও ১৯শে আগস্ট শ্রীম বাতে প্রায় শয্যাগত। বাম হাতে ও পিঠে বেদনা। তাই উভয় দিনই শ্রীম-র আদেশে দেবীভাগবত পাঠ হইল — শুকদেবের বৈরাগ্য। দ্বিতীয় দিনে অধিক পাঠ হইল কথামৃত — প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীযুক্ত কেশব সেন প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে নৌকাবিহার।

শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন। ভক্তগণও বসা। এখন রাত্রি আটটা। মোহন বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজের বক্তৃতার সারাংশ শ্রীম বলিতে বলিলেন। স্বামী অভেদানন্দ আজ self control (আত্ম-সংযম) সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছেন। মোহন সংক্ষেপে বলিতেছেন।

মোহন — একটিই বস্তু একজনকে সুখ দেয়, অপরজনকে দেয় দুঃখ। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, সুখদুঃখবোধ বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্ম নয়। এরা মন ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। এই জ্ঞানই সাধককে মন ও ইন্দ্রিয়সংযমে শক্তি প্রদান করে। সাধুরা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে। কেন? না, এতে তাদের সুখবোধ হয়। তাদের আদর্শ ঈশ্বরদর্শন। এর জন্যই তারা অনায়াস বা অল্পায়াসলব্ধ দ্রব্যে খুশি। মনটি সর্বদা ভগবানে সংলগ্ন করতে চেষ্টা করে। তারা চায় ব্রহ্মানন্দ, বিষয়ানন্দ নয়। ব্রহ্মানন্দের সন্ধান তাদের অধিক সুখ প্রদান করেন। তাই তারা বাহ্য বিষয় সুখকে গ্রাহ্য করে না। সামান্যভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ভিক্ষাম্নে সন্তুষ্ট থেকে মনের সবটা প্রায় ঈশ্বরের দিকে দেয়।

তোমাদের আদর্শ অতি উচ্চ রাখবে। সর্বদা তোমরা মনে রাখবে তোমাদের ঈশ্বরদর্শন করতে হবে, ঋষি হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে জীবনের অপর সকল সুখ বিসর্জন দিতে হবে। জগতের সকল সুখ ব্রহ্মানন্দের এক কণিকা। ব্রহ্মানন্দ লাভ হলে অতি বড় দুঃখেও মন থাকে অবিচলিত। এই অবস্থাটি লাভ করতে হলে, মনকে বিষয় থেকে উঠিয়ে এনে ব্রহ্মে, ঈশ্বরে স্থাপন করতে হবে। সারা জীবনভর এই অভ্যাস করতে হবে যতদিন না আদর্শ লাভ হয়। নিজেদের মনে করবে ঈশ্বরাত্মক। তাই অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, সাহস, সত্য ও মুক্তি তোমাদের ভিতর রয়েছে। এই কথা সदा ভাববে। তা হলেই ক্ষুদ্রতা সব ঘুচে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করবে — ভগবান, সহায় হও। আদর্শ কখনও নিচে নামাবে না — সর্বদা উচ্ছে রাখবে। ঈশ্বরদর্শন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য — মনকে এ কথা সর্বদা শোনাবে।

দেখ না, যার আদর্শ বিষয়ভোগ সে সর্বদা অশান্ত। একটা বিষয় আজ আনন্দ দিচ্ছে, কাল ওটাতে সুখ নেই। আর একটা বিষয়ের জন্য ছুটবে। এই করে মন চঞ্চল হয়। তা ছাড়া বিষয় ভোগের জন্য অর্থের দরকার হয়। সেই অর্থ সংগ্রহে মনের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাতে অশান্তি দুঃখ বাড়ে। মনঃসংযম হবে না। আবার যাদের অর্থ আছে তাদের উপর ঈর্ষা বেড়ে যায়, যাদের নাই। এই করে মন গোলকর্ধাধায় পড়ে যায়।

যারা ঋষি হবে তাদের অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে — শাক ভাতে তুষ্ট।

অভাব যত বাড়বে মনের বাজে খরচ তত অধিক হবে। তাই অল্পে তুষ্ট থেকে কাজে লেগে যাও, তোমরাই দু'দিন পরে ঋষি হবে।

শ্রীম — আচ্ছা, শনিবারের ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবেন, আমাদের কি খাওয়া উচিত। পঁচিশ বছর আমেরিকায় ছিলেন। এমন লোক আর পাবেন না। কতবড় পণ্ডিত! আবার ঠাকুরের অন্তরঙ্গ! তাই সকলের যাওয়া উচিত ওখানে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।

২২শে আগস্ট, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ,

৫ই ভাদ্র, ১৩৩০ সাল, বুধবার।

তৃতীয় অধ্যায় বেদান্তবক্তা 'কালী তপস্বী'

১

আজ বুলন পূর্ণিমা। ব্রাহ্ম সমাজের ভাদ্রোৎসবের শেষ দিন। সকালের সম্মিলন নয়টা হইতে এগারটা। শ্রীম-র আদেশে ভক্তগণ কেহ কেহ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীম নিজে যোগদান করেন। সঙ্গে ছিলেন ভক্তগণ — শুকলাল, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, মণি ও মণির পুত্র, দুর্গাপদ, সুধীর, জগবন্ধু প্রভৃতি। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে মোহন বেদান্ত সোসাইটিতে গিয়াছিলেন। উহা সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউতে স্থাপিত, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের দ্বারা।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন, কাছে ভক্তগণ। মোহন এইমাত্র ফিরিয়াছেন বেদান্ত সোসাইটি হইতে। শ্রীম মোহনকে বেদান্ত ক্লাসের নোট পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। গতকাল শ্রীম অসুস্থ থাকায় এই কথোপকথন-ক্লাসের নোট পড়া হয় নাই। তাই উহাই প্রথমে মোহন শুনাইতেছেন।

মোহন (স্বামী অভেদানন্দজীর প্রতি) — সাধকদের কি খাদ্য খাওয়া উচিত?

স্বামী অভেদানন্দ — ব্যাধিমুক্ত শরীর আবশ্যিক ঈশ্বরদর্শনের জন্য। অতএব যা খেলে শরীর ভাল থাকে তাই খাবে। সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা উচিত। তোমার শরীরের পক্ষে অনুকূল খাদ্য খাবে ...। দেশ দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছে এই খাদ্যাখাদ্যের বিবাদে।

আত্মসংযম হলো প্রথম সোপান ঈশ্বরদর্শনের। সত্যিকার সুখ কেবল এতেই আছে, এই ঈশ্বরদর্শনে। সংসারী লোক প্রত্যেকেই সুখ চায়। কি করে তা লাভ হয় তা সে জানে না সংসারচক্রে পড়ে। ঈশ্বরদর্শনই সুখের আকর — এই জ্ঞান নিয়ে সংসার করলে সুখ পাবে। ঋষিগণ ও

অবতারগণ সংসারে ছিলেন। শুধু জপতপ করে কি হবে মন বশীভূত না হলে? আমরা সব ভুক্তভোগী।

Ideal (আদর্শ) সামনে রেখে বিচার করবে, আসক্তি এলেই বিচার করবে।

প্রশ্ন — নিবৃত্তি তো ভোগের পর হয়?

উত্তর — ভোগ যত করবে ভোগের বাসনা তত বেড়ে যাবে। তবে জ্ঞানলাভের পর ভোগ করা যায়। তাতে আসক্তি থাকে না।

প্রশ্ন — জপেতে মন বশ হয় কি?

উত্তর — হাঁ, হয়। আদর্শ ঠিক থাকলে হবে। শুধু নামে কিছুই হয় না। মন, অনেক সময় কোন সাধু বা ঈশ্বরের হঠাৎ কৃপায়, অথবা স্বপ্নে, বশীভূত হয়। নির্জনে বসে তাঁর চিন্তা করতে হবে। রোজ practice (অভ্যাস) চাই। আসক্তি নিয়ে নির্জনে গেলে সেখানেই সংসার হয়ে দাঁড়াবে। যাতে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় তা করা দরকার। জপ, বিচার, সৎসঙ্গ, পরোপকার, কিংবা এখানে যে আসছে — এসবে উদ্দীপন হয়।

সৎসঙ্গ বড় দরকার। বাড়িতেও পাঁচজনের সঙ্গে বসে সদালাপ করবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২-৪০)। রোজ একটু একটু করতে করতে শেষে অনেকটা হয়ে যায়।

তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। যথার্থ হলে তিনি সহায় হন। বলবে, — প্রভো, আমাকে বিচার দাও — সদসৎ বুঝবার শক্তি দাও। এগুলি বেদান্তের শিক্ষা। Practice (অভ্যাস) না করলে কি হবে? শুধু পড়লে বা শুনলে কিছু হবে না।

প্রশ্ন — আচ্ছা, আমাদের এই শরীরে জীবাত্তা ও পরমাত্মা — এ দুই-ই আছে তো?

উত্তর — হাঁ, দুই-ই আছে। এই দুইয়ের মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। একটি আর একটির ছায়াস্বরূপ। (কঠ) উপনিষদে এই দু'টি পাখীর গল্প আছে। একটি পক্ষী, উপরে থাকে, আর একটি নিচে। গাছে সব রকম ফল ফলে — মিষ্টি, তেতো। মিষ্টি ফল খেলে আনন্দ। আর তেতো খেলেই কষ্ট। ওপরের পাখীটি কিছুই খায় না, সাক্ষী। খালি দেখছে। নিজের কোনও interest (আসক্তি) নেই। নিচেরটার তা নয়।

সে মিষ্টি, তেতো সব ফল খাচ্ছে। তাই সুখদুঃখের আবর্তে পড়ে যায়। উপরেরটি পরমাত্মা। নিচেরটি জীবাত্মা। জীবাত্মা তেতো ফল খেতে খেতে disgusted (বিরক্ত) হয়ে পড়ে। তখন বন্ধুর কথা ভাবে। তার দিকে যেতে চায়। ক্রমে ক্রমে তার দিকে এগিয়ে যায়। শেষে তাতে মিশে যায়। দেহটিই বৃক্ষ। আর পক্ষীদু’টি — পরমাত্মা আর জীবাত্মা।

তোমরা পরমাত্মার অংশ। God made man after His own image (ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের প্রতিমার অনুরূপ করে)। কিন্তু তা থেকে পৃথক হয়েই যত দুঃখ কষ্ট। কঠোপনিষদে আছে, ‘ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে’ — জীবাত্মা নিজ কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু পরমাত্মা কিছুই ভোগ করেন না, সাক্ষীস্বরূপ। এই ভোগেই জীবাত্মার পতন হয়। এই ভোগ ত্যাগ করলে মুক্তি হয়। পরমাত্মা থেকে পৃথক, এই জ্ঞানেই দুঃখ কষ্ট ভোগ হচ্ছে।

এক পরমাত্মা। কিন্তু তাঁর ছায়া সকলের হৃদয়ে। সূর্যের কিরণে কতকগুলি পাত্রে জল রেখে দাও। একই সূর্যের কিরণ নানা পাত্রে পড়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। আসলে কিন্তু সূর্য এক। যেমন এটি, তেমনি একই পরমাত্মার ছাপ পড়েছে সর্বজীবে। জীব যদি ভাবে আমি পৃথক, তবেই দুঃখ। যদি মনে করে আমার independent existence (পৃথক সত্তা) রয়েছে, তখন মোহে পতিত হবে। তাই উপনিষদে বলেছেন— ‘অনিষয়া মুহ্যমান’। জীব যে ঈশ্বর, এই জ্ঞান না থাকায় জীব মোহে পড়েছে বুঝতে হবে। তাই ‘মুহ্যমান’।

সর্বজীবে পরমাত্মা নিবাস করছেন। তিনি না থাকলে এক মুহূর্তও থাকতে পার তুমি? তুমি যে এখানে বসে আছ, এটাও depend (নির্ভর) করছে universe-এর (বিশ্বের) ওপর। সূর্য নবগ্রহ দ্বারা আকৃষ্ট। এই সূর্য আবার আর একটি সূর্য দ্বারা পরিচালিত। এইরূপ অনন্ত ব্যাপার। আবার এই সবই depend (নির্ভর) করছে ঈশ্বরের উপর। তিনি না থাকলে কিছুই চলতে পারে না।

মোহে পড়ে আজকালের ছেলেরা বলে, আমি হেন করবো, আমি তেন করবো, আমি জড়বিজ্ঞানের দ্বারা নাম যশ অর্থ উপার্জন করবো। আরে, তুমি কি নাম, কি যশ, উপার্জন করতে পার? তুমি কি

নেপোলিয়ানের মত হতে পেরেছ? তিনিই বা কি করলেন? ঈশ্বরের তুলনায় তিনি কিছুই না, একেবারে কিছু নন। তা তুমি আর কি করবে বল? আমরা কীটানুকীট। আমরা কি করতে পারি? আগে আমরা মনে করতাম, সব করতে পারি। এখন দেখছি, আমরা কিছুই করতে পারি না। সব তিনি করছেন। এক মতে আছে, পৃথিবীটা বিশ্বের comparison-এ (তুলনায়) একটি বালুকণা থেকেও ছোট।

পৃথিবীর সকলের মন এক একটি আবর্ত, মস্ত বড় একটা নদীর। অন্যের মনের ভাব জানতে চাও তো ঐ নদী দিয়ে যাও, জানতে পারবে। আমি বুঝতে পারি, আমেরিকায় আমাকে কে চিন্তা করবে। একে বলবে telepathy (টেলিপ্যাথি)। যোগীদের এ শক্তি ছিল। তাঁরা সব পরীক্ষা করে নিতেন।

ঈশ্বরকে ভুলে কি হবে? আলোচনা কর, কার শক্তিতে আছ। বৃক্ষ, মশক, কুকুর প্রভৃতির ভিতর ঈশ্বরের শক্তি রয়েছে। এসব বিষয় আলোচনা কর।

প্রশ্ন — স্বপ্ন কি? ইহা সত্য কি?

উত্তর — এটা আপেক্ষিক সত্য। এ তোমার মানসিক চিন্তার প্রতিচ্ছবি। যতক্ষণ তুমি স্বপ্ন দেখছো ততক্ষণ তা সত্য। স্বপ্নে তোমার মন কর্মঠ। স্বপ্নে তুমি একটি জীব দেখছো। তার অর্ধেকটা মানুষ, আর অর্ধেকটা অশ্ব। যখন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, তুমি সেটা দেখতে পাচ্ছ না। ঐরূপ জীব তোমার সামনে নাই।

প্রশ্ন — মানুষের freedom (স্বাধীনতা) আছে কি?

উত্তর — আছে। যেমন, যতক্ষণ হাত আছে ততক্ষণ স্বাধীন, ভেঙ্গে গেলে পরাধীন। তখন কাজ করতে পারে না। যেমন পা ভেঙ্গে গেলে আর চলতে পারে না, তেমনি।

২

প্রশ্ন — পাপপুণ্য কাকে বলে?

উত্তর — পাপপুণ্য, ভালমন্দ — এসব নির্ভর করে প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট চিন্তা, আচরণ ও রীতিনীতির উপর। মুসলমান ধর্মে একাধিক

বিবাহের অনুমতি আছে। খ্রীস্টধর্ম ইহার নিন্দা করে। এতেই দেখা যাচ্ছে বিবেকজ্ঞান সর্বত্র একরূপ নয়। অতএব, এই বিবেকজ্ঞান ভালমন্দ নির্ণয়ের মানদণ্ড হতে পারে না। একজন নরঘাতককে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু একজন সেনাপতি পূজিত হয়, আর তার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। তাই তোমার কাছে যা ভাল, অন্যের নিকট উহা মন্দ। একজনের নিকট যা বিষ, আর একজনের কাছে তা ওষুধ। অগ্নি দাহ করে, কিন্তু উহা একজন ঠাণ্ডায় জড়প্রায় লোকের প্রাণরক্ষা করে। তখন উহা ভাল। কিন্তু যখন অগ্নি একটি শিশুকে দগ্ধ করে, কিংবা একটি গৃহ ভস্মীভূত করে তখন আমরা বলি, অগ্নি মন্দ। অগ্নি সর্বাবস্থায় দগ্ধ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অগ্নি একই সময় ভাল ও মন্দ।

এই সংসারে যা আমাদের বাসনার অনুকূল তাই আমাদের কাছে ভাল। যা অনিষ্ট, ক্ষতি ও দুঃখের কারণ হয় তা মন্দ। নিজের বা অপরের মঙ্গলের জন্য আমরা যা করি তাকে বলে পুণ্যকর্ম। যে কর্ম আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ করে, কিন্তু অপরকে দুঃখ দেয় তাকে বলি পাপকর্ম, মন্দকর্ম।

আমরা শিশুকে বলি, আগুনে হাত দিও না। কিন্তু যদি তবুও সে হাত দেয় আর বুঝতে পারে — আগুন দগ্ধ করে, তাহলে বলতে হবে আপাতদৃষ্টিতে যা মন্দ কর্ম, পরে তার ফল হয় মঙ্গলকর। অজ্ঞান থেকে যা করা হয় তাই পাপকর্ম।

খ্রীস্টানগণ বিশ্বাস করে, এই বর্তমান জন্মই পৃথিবীতে আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এটা বিশ্বাস করে না। অনন্ত স্বর্গ বা নরকে তাদের বিশ্বাস নাই। তারা বলে, এই স্বর্গ নরক ক্ষণস্থায়ী। উহা মনের সৃষ্টি। হিন্দুরা বলে, আজ যে নরকে আছে কাল সে স্বর্গে যেতে পারে। তারা বিশ্বাস করে, আত্মা অমর। কর্মফলে বারবার জন্মমরণ হয় আত্মার। আর আত্মার চরম অবস্থা পরিপূর্ণতালাভ বা মুক্তি।

খ্রীস্টানগণ তা স্বীকার করে না, তাদের একজন্মবাদের দোষ এই। কি করে একজন লোক, ধর, তার সত্ত্বর বছরের একটি জীবনেই সকল ভালমন্দ কাজ শেষ করতে পারে!

একজন পুণ্যাত্মা কোন মন্দকর্ম করতে পারে না, না পারে অপরের সঙ্গে প্রতারণা করতে। কারণ সে বিশ্বাস করে, অনুভব করে, মনুষ্যজাতি

তারই অংশ। একজন পাপাত্মা অপরের অনিষ্ট ক'রে বস্তুতঃ নিজেরই অনিষ্ট ক'রে থাকে।

প্রশ্ন — যে পরজন্মে বিশ্বাস করে না, তার কি দশা হবে?

উত্তর — এ বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। এটা একটা সত্য। মাধ্যাকর্ষণ একটা সত্য। এখন তুমি এটা বিশ্বাস কর আর নাই কর। বুদ্ধ তাঁর অতীত পাঁচশ' জীবনের কথা জানতেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, তোমার ও আমার এর পূর্বে বহুজন্ম হয়ে গেছে। তুমি তা জান না। কিন্তু আমি সব জানি।

চরম সত্যের জ্ঞানই ধর্ম। এ সকল সংশয় ও দুঃখের অবসান ঘটায়। এইজন্য ধর্মের প্রয়োজন। যে ধর্ম সকল সংশয় ও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি না করতে পারে, তাকে কি করে ধর্ম বলা যায়? খ্রীস্টধর্ম এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারে না।

প্রশ্ন — Ressurection (মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান) কি?

উত্তর — খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ বিশ্বাস করে, কবর থেকে মৃত ব্যক্তির শরীর পুনরুত্থান করে। কিন্তু হিন্দুরা বিশ্বাস করে spiritual body-র (কারণশরীরের) পুনরুত্থান, উর্ধ্বগতি। তাই খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ মৃত ব্যক্তির শরীরটা কবরে রাখে। আর হিন্দুরা দাহ করে দেয়। তাতে পঞ্চভূতের শরীর পঞ্চভূতে মিশে যায়। খ্রীস্টান ও মুসলমান বিশ্বাস করে, কবর থেকে মৃত শরীরটা অস্তিম বিচারের সময় উঠে এসে দাঁড়াবে। বিচারের ফলে, হয় অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে যাবে।

মৃত শরীরের দাহপ্রথা উত্তম। আমেরিকায় আমি উহার প্রচার করেছি। আজকাল ওদেশে অনেক দাহকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। আমাদের বেদান্তবাদী ভক্তদের দাহকেন্দ্রে আমি পৌরোহিত্য করেছি।

পরমহংসদেব বলতেন, 'সব শেয়ালের এক রা'। 'শেয়ালে' মানে সাধুগণ, ধর্মাচার্যগণ। সকল ধর্মেরই সারভাগ ও অসারভাগ আছে। সারভাগে সকল ধর্মাচার্যদের মত এক, সমান। বিবাদ হয় যত অসার ভাগ নিয়ে। এ থেকেই যত সব কুসংস্কারের সৃষ্টি। হিন্দুদের বহু কুসংস্কার আছে।

সকল মানুষকেই মিশ্র কর্ম করতে হয়। সব ভাল, কি সব খারাপ,

এরূপ কর্ম করার যো নেই। ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম মানুষ করে।

ঘট ভাঙলে মাটি হয়। মাটিও ভাঙা যায়। তখন আকাশ হয়। আকাশ প্রথম সৃষ্টি। তারপর বায়ু আদি।

আমি তোমার ভিতর দু'টি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, — জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান নাই। খোঁজ, তা হলে পাবে — seek and ye shall find. সাধনের দরকার। মন purify (শুদ্ধ) করতে হবে। চিত্তশুদ্ধির দরকার। Blessed are the pure in heart, for they see God —পবিত্র হৃদয় যার, ঈশ্বর করতলে তার।

(একজন ভক্তের প্রতি) ছয় মাস সাধন কর, তবে বুঝবে। সাঁতার শিখে জলে নাবে না — সাঁতার শিখবার জন্য জলে নাবে। তপস্যা কর, সব বুঝতে পারবে। তপস্যার বড় দরকার। এছাড়া কিছুই হয় না। তপস্যা — তপস্যা চাই।

প্রশ্ন — আচ্ছা, আকাশ প্রথম সৃষ্টি করলেন, তার প্রমাণ কি?

উত্তর — বাবা, তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না। পঞ্চাশ বার বললেও হয় না। এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক কান দিয়ে বের হয়ে যায়। বৃথা সময় নষ্ট করতে পারি না।

৩

প্রশ্ন — গুরুবাক্যে বিশ্বাস কি অন্ধবিশ্বাস?

উত্তর — না, গুরুবাক্যে বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নয়। একজন বেশী জানে। তার নিকট তুমি শিখছ। একে অন্ধবিশ্বাস বলে না। অন্ধবিশ্বাস — যেমন সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এই বিশ্বাস। সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই এর।

প্রশ্ন — দ্বৈত ভাবসাধনা — শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর — এইগুলির সাধনা একজনের একসঙ্গে হতে পারে কি?

উত্তর — হতে পারে। তবে একসঙ্গে নয়। পরমহংসদেব সবগুলির সাধন করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন — পরমহংসদেব বলতেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। উহা কেমন? যেমন, একটা গরু খুঁটিতে বাঁধা আছে। যতটুকু দড়ি ততটুকু

স্বাধীন। এর বেশী যেতে পারে না।

উত্তর — হাঁ। আমরা যা বলেছি উহাও তাই — তাঁরই কথা।

প্রশ্ন — আমরা কি প্রতিদিন কর্মদ্বারা চালিত হই?

উত্তর — তুমি তোমার অতীত কর্ম দ্বারা চালিত। বাসনা ও প্রবৃত্তি নূতন কর্ম সৃষ্টি করে। কর্ম কিছু বাহ্য জিনিস নয়। তোমার নিজের দেহ মন তোমার কর্মের অংশ। কর্ম জনসঙ্গে বসে থেকে তোমায় চালিত করে না। তোমার ভিতরই রয়েছে। দেহ ও মন কর্মদ্বারা নির্মিত। সেই মনই তোমায় চালিত করে। তোমার ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, কিন্তু সুপ্তাবস্থায়। কাল যা হবে, তুমি আজ তা করছো।

প্রশ্ন — ঠাকুর প্রার্থনা করতেন, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী — এই যন্ত্র যন্ত্রী কি?

উত্তর — তাঁর ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা নয়। যাঁর এ জ্ঞান হয়, তিনি তখন ঝড়ের ঐটো পাতার মত হয়ে যান। যেমন ইন্জিন। এটা যন্ত্র। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্রী, অর্থাৎ চালক। এই বিশ্বটাই তাঁর ইচ্ছায় চলেছে যন্ত্রবৎ। কিন্তু তিনি যন্ত্রী, চালক। তেমনি প্রত্যেক জীবের ভিতর থেকে তিনি চালনা করছেন। তিনি যন্ত্রী — এ জ্ঞান হলে, 'তুমি' মরে যাবে। তখন তিনি যা করেন তাই করবে। তোমার বড় individuality (ব্যক্তিত্ব) আসবে। এখন আছ ছোট, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র — অন্ধের মত চোখ বুজে আছ।

প্রশ্ন — মনুষ্যজন্মের পর পশুজন্ম হতে পারে কি?

উত্তর — এক মতে, হতে পারে। যেমন জড় ভরত। প্রথম জন্মে রাজা। দ্বিতীয় জন্মে হন হরিণ। আর তৃতীয় জন্মে পরমহংস। আর এক মতে — মানুষ হয়ে পরজন্মে পশুদেহ ধারণ করতে পারে না। তবে মানুষশরীরে পশুভাব নিয়ে জন্ম হয়। মানুষশরীরে সাপটাপের ভাব নিয়ে জন্ম হয়।

প্রশ্ন — আপনার কোন মত?

উত্তর — আমার মনে হয়, শেষটাই ভাল। তবে তুমি একান্ত ইচ্ছা কর, বাঘ হতে পার (সকলের উচ্চহাস্য)। 'যাদৃশী প্রকৃতি যস্য ভাবনা ভবতি তাদৃশী।'

প্রশ্ন — প্রকৃতি কয় রকম?

উত্তর — দু'রকম প্রকৃতি — spiritual and material (আধ্যাত্মিক ও জড়)। Soul is the part of the spiritual — প্রকৃতি (জীবাত্তা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অংশ)।

প্রশ্ন — Soul and God, (জীবাত্তা ও ঈশ্বর) এই দুইয়ের eternity (শাস্তত সত্তা) খ্রীস্টিয়ানরা বিশ্বাস করে কি?

উত্তর — হ্যাঁ, soul-এর (জীবাত্তার) future-টা (ভবিষ্যৎটা) বিশ্বাস করে। Past-টা (অতীতটা) নয়। God-এর (ঈশ্বরের) বিশ্বাস করে। আমি তোমাকে কেবল যুক্তি দিতে পারি, কিন্তু brain (মস্তিষ্ক) নয়। এসব যখন বুঝবে তখন বুঝবে। বুঝান যায় না। তবে শুনে রাখা ভাল, পরমহংসদেব বলতেন।

প্রশ্ন — Mesmerism (মেস্‌মেরিজম) কাকে বলে?

উত্তর — মেসমার সাহেব বের করেছেন বলে এই নাম। এর মানে, একটা thought-এর (চিন্তার) উপর আর একটা thought-এর (চিন্তার) action (ক্রিয়া)। Cat and bird (বিড়াল ও পাখী) দেখ। পক্ষী খেতে এসেছে। আর বিড়াল তাকে খেয়ে ফেললো। আমেরিকায় Ugene's blind-folding theory (ইউজেনের ব্লাইণ্ড-ফোলডিং মত) আছে। এটা বড়ই অদ্ভুত জিনিস। পাঁচশ' লোকের একটা সভা। একটা লোকের উপর আর একটা লোকের আদেশ হল — ঐ ঘর থেকে ঐ ছবিটা নিয়ে এসো। তারপর ঐ মোটর গাড়ীতে ঐটে নিয়ে গিয়ে বস। সে যন্ত্রচালিতের মত তাই করলো। তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। আমি নিজচক্ষে এটা দেখেছি।

ওরা কত করছে এখন। Spirit-এর (প্রেতের) সঙ্গে কথা কইছে। হাতে হাত দিয়েছে। আমার কাছে লেখা আছে। ওয়ারলেস টেলিগ্রাফি, টিয়ারগ্যাস — এসব ঋষিরা ভেবেছিলেন কি?

হায়রেন্ ম্যাক্সিম আর হায়ডেন্ ম্যাক্সিম্ (Hyren Maxim and Hyden Maxin) মেক্সিম্ গানের (বন্দুকের) আবিষ্কর্তা। তাঁরা smokeless (ধূমবিহীন) বন্দুকের বারুদ আবিষ্কার করেছেন। আমেরিকায় আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এঁদের। আমায় ভারতের লোক বলে খুব খাতির করতেন। বললেন, quotation (উদ্ধৃতি) করলেন, বন্দুকের বারুদ রাম-

রাবণের যুদ্ধে আবিষ্কৃত হয়। বারুদ চীনারা বের করেছে প্রথমে — এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন, ভারতবাসীই প্রথম বারুদ বের করেছে। আরও বললেন, কাঁচ আমাদের দেশের (ভারতের) জিনিস। Taxila-র Museum-এ (তক্ষশীলার যাদুঘরে) আমি কাঁচের টাইল দেখেছি। মহাভারতে আছে, ময়দানব কাঁচ দিয়ে পাণ্ডবসভা এমন করে বানিয়েছিল যে, সব জলময় বলে ভ্রম হতো। দুর্যোধন নিজের পরনের কাপড় বাঁচিয়ে চলেছে — তাতে সভাশুদ্ধ লোক হাস্য করল। দুর্যোধন নাকাল হল।

ভারতে কাঁচের বোতল ছিল, সব ছিল। ভুলে গেছ। এখন আমেরিকা যাচ্ছ শিখতে। একটি ছোকরা শিখে এসেছে। তোমরা তাকে patronise (সাহায্য) কর। সে মানিকতলায় ফ্যাক্টরি করেছে। দার্জিলিং-এ আমি একটি ইংলিশম্যানকে দেখলাম। সে দেশলাই কিনতে গেছে, তাকে জাপানী দেশলাই দেওয়া হল। নিলে না। বললে ইংলিশ মেক্ দাও। কিন্তু তোমরা দেশের জিনিস ছেড়ে অপরের জিনিস নাও। অন্যদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তোমরা পেছনে পড়ে আছ। কাজ কর। তোমরাও উপরে উঠবে।

আমেরিকায় একবার থিয়েটার দেখলাম। চীনারা দেখালে। একটা triangular (ত্রিকোণ) জিনিস শূন্যে মারলে। সেটা semicircle (অর্ধবৃত্ত) করে নিচে ফিরে এলো। এখন সায়েন্সের যুগ, তোমরা এসব কর। জড়তা ভেঙে উপরে ওঠ। ভারত আগে অনেক কিছু করেছিল। নানা দেশদেশান্তরে যেতো। এখন কুনো হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় একটা প্রদেশ আছে। নাম কুমেরাং, ভারতের লোক ওখানে যেতো। নিউজিল্যান্ডেও যেতো। মহাভারতে এসব দেশকে ইষিকবাস নামে বলা হয়েছে।

৪

প্রশ্ন — ভগবানের চিন্তার সহিত যাদের চিন্তা মিলে যায় তারা যা ইচ্ছা করে, তা করতে পারে। Hypnotist (সম্মোহক) অপরকে বশ করতে পারে। তাহলে তার চিন্তাও কি ঈশ্বরের চিন্তার সঙ্গে মিলে যায় তখন?

উত্তর — না। তবে কতকগুলি নিয়ম আছে thought-এর (চিন্তার)। সে সেগুলি আয়ত্ত করেছে। সেগুলির দ্বারা অপরকে বশ করে! ঐ নিয়মগুলিও ঈশ্বরের কিনা। এ হিসেবে বলা যেতে পারে যাদুকরের চিন্তা ঈশ্বরের চিন্তার সহিত মিলে গেছে। এটা নিম্ন অর্থে। কিন্তু যোগীদের চিন্তাই ঈশ্বরের চিন্তার সহিত এক হয়ে যায়। ঐতে যোগীরা সব করতে পারে। দেখ, এই যে electricity (বিদ্যুৎশক্তি) কাজ করছে — পাখা ঘুরছে, এতেও ঈশ্বরের নিয়মই কাজ করছে। শেষে দাঁড়াবে, সারা জগৎটাই তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর শক্তিতে চলছে। এসব বিষয় যত আলোচনা করবে ততই বুঝতে পারবে সবই ঈশ্বরশক্তির অধীন। আরও বুঝতে পারবে তুমিও তাঁর শক্তিতে চলছো। সর্বশেষ বুঝতে পারবে তুমি তাঁর সন্তান, সর্বজ্ঞের বাচ্চা।

প্রশ্ন — Evil spirit (অশুভ শক্তি) কি?

উত্তর — সাধারণভাবে এটাতে একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি বোঝায়। পদ্মানদী ভাঙছে। একদিকে চড়া পড়ছে। এদিকের লোক বলছে, বেশ ভাল, good হচ্ছে। অন্যদিকে নষ্ট হচ্ছে। তারা বলছে, মন্দ হচ্ছে, evil। যা তোমায় সুখ দেয় সেটাকে বলছে ভাল, good। যা তোমার অনিষ্ট করে, তোমার স্বার্থের হানি করে, অকল্যাণ করে, সেটাকে বলছে মন্দ, evil। রাম প্রজাকে সুখ দিতেন তাই রামরাজ্য ভাল, good। তার উল্টো হলে মন্দ, evil। যারা কেবল পরের অনিষ্ট করে, তারা হীন স্তরের লোক। এদের আনন্দ অপরের অনিষ্ট করে, callous (নির্মম) হয়ে অপরকে দুঃখ দিতে দিতে। এদেরও evil spirit (দুষ্ট লোক) বলে।

আবার, প্রেতাত্মাদের spirit (ভূত) বলে। এদের ভিতরও ভাল মন্দ, দুই ক্লাস আছে। ভাল প্রেত লোককে সাবধান করে দেয়, তার ভাল করে, তাকে বলে good spirit (ভাল প্রেতাত্মা)। যে অনিষ্ট করে, তাকে বলে দুষ্ট প্রেতাত্মা — evil spirit।

আবার দেখ, একজন সন্ন্যাসী একজনকে পরমার্থ উপদেশ দিল। সে লোক ঘর ছেড়ে চলে গেল পরমার্থসাধনে। যে অজ্ঞান, বিষয়ভোগী সে বলবে এটাকে মন্দ। যে ঈশ্বরপ্রেমিক সে বলবে ভাল, good। ডাক্তার ছুরি চালায় লোকের ভালর জন্য। এটা বাইরে মন্দ দেখালেও, শেষে ভাল

— রোগীর সুখ হয়।

একদিক দিয়ে ভাল, অপর দিক দিয়ে মন্দ। এই ভালমন্দ দ্বন্দ্বকে বলে সংসার।

পরমহংসদেব বলতেন, পায়ে কাঁটা বিঁধেছে একজনের। সে আর একটা কাঁটা এনে এটাকে তুলে, দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়। তেমনি জ্ঞানকাঁটা দিয়ে অজ্ঞানকাঁটা তুলে, জ্ঞান-অজ্ঞান দুই-ই ছেড়ে বিজ্ঞানী হয়ে যাও। অর্থাৎ সমাধিস্থ হও, সর্বভূতে সমদর্শী হও। যতক্ষণ দ্বৈতে বাস, ততক্ষণই ভাল মন্দ, দুই। অদ্বৈতী হলে খালি ভাল।

প্রশ্ন — ওয়েস্টের লোক কি আমাদেরই মত শিক্ষা করে, যেমন এখানে আমরা করছি?

উত্তর না, ওরা লেকচার দেয়। কাগজে লিখবে, তর্ক করবে না। আমেরিকায় conversation class (কথোপকথন প্রথা) ছিল না। ভারতের প্রথা, মজলিশ করে বসে ধর্ম শিক্ষা করা।

প্রশ্ন — Personality (ব্যক্তিত্ব) না হলে তো ঈশ্বরদর্শন হয় না!

উত্তর — না, তা কি করে হবে? Personality মানে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি। চিত্ত শুদ্ধ না হলে কি করে হতে পারে? শুদ্ধচিত্তে ভগবান দর্শন দেন।

উত্তর — অধঃপতন হয়ে যায় কোথায়? তাঁতেই থাকে। পতন হয়, আবার জ্ঞান হয়। আগুন গরম। তুমি বলছে ঠাণ্ডা? যেই ওতে হাত দিলে অমনি হাত পুড়ে গেল। তখন তোমার জ্ঞান হলো, আগুন গরম। তখন বুঝলে। নবজাত বাছুরটা পড়ে যাচ্ছে বার বার। শেষে উঠছে। এই বার বার পতন, উত্থানের কারণ। তাই বলে, mistakes are the masters in the long run — ভুলই শেষে শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন — ঈশ্বর কি সাকার?

উত্তর — তিনি সাকার, নিরাকার এই দু'য়েরই পার। আবার কত কি। ঈশ্বরের ইতি হয় না — পরমহংসদেব এসব কথা বলতেন।

প্রশ্ন — মুক্তি কি?

উত্তর — বন্ধন থেকে মুক্তি। অজ্ঞান দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছো। জ্ঞান লাভ করে সেই বন্ধন ছিন্ন করো মানুষ সব ঈশ্বরের সন্তান, এই

জ্ঞানলাভ মুক্তি। আর অজ্ঞান বন্ধন কি? আমি অমুক মানুষের পুত্র — এই অজ্ঞান থেকে নিজেকে মুক্ত করাই মুক্তি। ভগবানকে ছেড়ে যত জ্ঞান, সব অজ্ঞান। তাঁর দর্শন হলে জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভই মুক্তি।

প্রশ্ন — উত্থান পতন কি?

উত্তর — উত্থান পতন বলে কিছু নেই বস্তুতঃ। সবই তাঁতে — ঈশ্বরে। যেমন একটা মই। তুমি কতকগুলি ধাপ উঠেছ। তখন যদি নিচের দিকে তাকাও — দেখবে, তুমি উপরে আছ। আবার উপরের দিকে যদি তাকাও — দেখবে, তুমি নিচে আছ। একই মইয়েতে তুমি আছ। অবস্থার তফাৎ মাত্র।

প্রশ্ন — স্বধর্ম কাকে বলে?

উত্তর — মনের স্বাভাবিক ভাবনা, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা। সংস্কার অনুযায়ী কাজ।

প্রশ্ন — ‘সর্বধর্মান’ কি?

উত্তর — সকল রকম কর্তব্য — সামাজিক, পারিবারিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক কর্তব্য। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা আচরণ, বিশ্বাস, মত। ঈশ্বরভজন ছাড়া ধর্মসাধনের অসার ভাগ, এর অর্থ।

প্রশ্ন — এমন উপায় আছে কি, যাতে কাজ করলে মনের ওপর দাগ না লাগে, সংস্কার সৃষ্টি না করে?

উত্তর — না। এ পড়বেই, দাগ লাগবেই। তবে দমন করা যায় যখন বুদ্ধবুদ্ধ উঠে। আগে থেকে বিচার কর, সাবধান হও, তবে কিছু রক্ষা হতে পারে। শুভ অশুভ সংস্কার দুই-ই জন্মমরণের কারণ। এর হাত থেকে রক্ষা হয় কেবল ঈশ্বরের শরণাগত হলে। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে আলোকিত হয়ে যায়, ঈশ্বরের কৃপায়, ঠাকুর বলতেন। দাগ পড়বে আবার উঠে যাবে, জ্বলে যাবে তাঁর কৃপায়।

প্রশ্ন — ঈশ্বরলাভ কি সকাম নয়।

উত্তর — না। তা নয়। পরমহংসদেব বলতেন, মিষ্টি বেশী খেলে অল্পশূল হয়। কিন্তু মিছরি খেলে অল্পশূল নষ্ট হয়। ‘মিছরি’ মিষ্টির মধ্যে নয়। ‘হিন্চে’ শাকের মধ্যে নয়।

প্রশ্ন — আহারশুদ্ধির অর্থ কি?

উত্তর — যা খেলে কামাদির উৎপত্তি না হয় সেই আহারই শুদ্ধ

আহার। মাছ মাংস খেলে যদি তা বাড়ে তৎক্ষণাৎ তা ছাড়া উচিত। আবার শাকসব্জী খেলেও যদি বাড়ে তখন তাও ছাড়া উচিত। কি খাবে, তা তুমি নিজেই বুঝবে। একজন ছুঁয়ে দিলে বা দেখলে আহারের সময়, আহার্য শুদ্ধ থাকে না, নষ্ট হয়ে যায় — এটা রামানুজসম্প্রদায় মানে। পুরীতে ছিলাম এদের মধ্যে। দেখলাম, ঘরের চারকোণে চারজন খাচ্ছে। একজন অব্রাহ্মণ ছিল। তার কাছে বসে খাবে না। এ সব আমরা মানি না। এ করে করে দেশ উচ্ছেন গেছে।

আজকের ক্লাসে স্বামী অভেদানন্দ একজন সভ্যকে কিছু অপ্ৰিয় কথা বলিয়াছেন। সভ্যের মন ক্ষুণ্ণ। তিনি ঐ ক্লাসে আর যাইতে চান না। শ্রীম এই কথা শুনিয়া সভ্যকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম (সভ্যের প্রতি) — ও সব তো আছেই। ওতে মন দিতে নেই। যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের অনেক জানতে হয়। নিজের প্রাণ নরুনেই নেওয়া যায়। অন্যের নিতে হলে ঢাল তলোয়ারের দরকার হয়। 'রাম রাম' করলেই নিজের হয়ে যায়।

যার প্রকৃতিতে যা আছে সে সেই দিকেই যাবে। সায়েন্স যে পড়েছে, তার সায়েন্সের কথা ভাল লাগবে।

কাল ভাগবতে পড়া হয়েছিল জয় বিজয়ের কথা। সনকাদি মুনিরা ভগবানের স্তব করছেন। বলছেন, তুমি না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? তুমি ভিতরে জগত হয়ে আছ বলেই 'ব্রাহ্মণ' ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ভগবান। তাঁকে যে জানে সে-ই ব্রাহ্মণ, এই কথাই মুনিরা বলছেন।

বেদান্ত ক্লাসে যাওয়া উচিত। 'কালী তপস্বী' ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, আর মহাপণ্ডিত। আবার আমেরিকায় পঁচিশ বছর বাস। তাঁর কথা শোনা উচিত। মনোযোগ দিয়ে শুনে বাড়িতে এসে লিখে রাখা উচিত। এতে মনে ছাপ পড়ে যায়। আমরা তাই করতাম। ঠাকুরের কথা শুনে এসে লিখে রাখতাম। তা থেকে কথামূতের সৃষ্টি। মধুকর হয়ে সকল ফুল থেকে মধু আহরণ করে একটি মধুচক্র রচনা করা। তাতে জীবন মধুময় হবে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। ২২শে ভাদ্র ১৩৩০ সাল, শনিবার।

চতুর্থ অধ্যায় একদিকে জগন্নাথ, অন্যদিকে বৈদ্যনাথ

১

মর্টন স্কুল। চারতলা। শ্রীম-র কক্ষ। সকাল সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ব্যস্ত।
অশ্ববাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রীঃ, বুধবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।

শ্রীম (অশ্ববাসীর প্রতি) — একটা important (অতি প্রয়োজনীয়)
কাজ করতে হবে এখন। জিতেন মহারাজের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের) কাছে
যেতে হবে। ইনি রয়েছেন অদ্বৈতাশ্রমে। বড় অন্যায়ে হয়েছে কাল তাঁকে
অমন করে বলায়। আপনি হাত জোড় করে বলবেন, উনি (শ্রীম) আমায়
পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে apology (ক্ষমা) চাইতে। বলবেন,
আমরা মনে করেছিলাম, সেই বিশ বাইশ বছরের ছেলে জিতেন মহারাজ।
মনে কর কত তপস্যা করেছেন আর এখন বড় হয়েছেন। অমন করে
বলা আমাদের ঠিক হয় নাই।

একটি ভক্ত (স্বগত) — আশ্চর্য ব্যবহার মহাপুরুষদের! স্বামী
বিশুদ্ধানন্দ অতি অল্প বয়সে সাধুজীবনের প্রারম্ভিক প্রেরণা ও উদ্দীপনা
শ্রীম-র নিকট পান। তথাপি এখন তিনি সন্ন্যাসী, তপস্যা করেছেন আর
বয়স হয়েছে বলে কত মান দিচ্ছেন। এমন আর কি বলেছেন কাল রাত্র।
একটু জোরে বলেছেন, complain (অসন্তোষ প্রকাশ) করা কেন,
ঠাকুরের অত অহেতুক কৃপা পেয়েও। বলেছেন, এটা ভাবতে হয়। আর
শরণাগত হয়ে থাকলে বাকীটাও অর্থাৎ, দর্শন দিয়েও কালে কৃতার্থ
করবেন ঠাকুর।

মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট। অদ্বৈত আশ্রম। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির পিছনটা।
সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম-র উপদেশমত অশ্ববাসী কথা কহিতেছেন।

অশ্ববাসী (স্বামী বিশুদ্ধানন্দের প্রতি) — শ্রীম আমাকে পাঠিয়ে

দিয়েছেন যুক্তকরে আপনার নিকট apology (ক্ষমা) চাইতে। কাল রাত্রে আপনাকে বিশ বাইশ বছরের ছেলে মনে করে অমন বলেছিলেন।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (লজ্জিত হইয়া সবিনয়ে) — সে কি, আমি তো তাঁর কাছে ছেলেমানুষ। এ যে আমার সৌভাগ্য! এতেই যে আমার গর্ব! তিনি আজও আমাকে পূর্বের ন্যায় আপনজন মনে করেন। আর পিতার ন্যায়, গুরুজনের ন্যায়, অযাচিত আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন। সত্যই আমি অন্তরে কাল প্রচুর তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেছি। এঁদের এই স্নেহবর্ষণই যে আমাদের পথের সম্বল! শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্যদদের স্নেহশিস্ লাভ, একি কম কথা! এর চাইতে বড় সৌভাগ্য সাধুর আর কি হতে পারে?

শ্রীম-র ঐরূপ সশ্রদ্ধ সপ্রেম ব্যবহারে আশ্রমবাসী সাধুগণ হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের পক্ষেই সম্ভব এইরূপ দৈবী আচরণ, এই অমানিমানদ* ব্যবহার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দ, আর জামতাড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মহন্ত স্বামী রামেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন। এখন সকাল প্রায় সাতটা। সাধুরা তৈরী হইয়া আসিয়াছেন শ্রীমকে বিদ্যাপীঠে লইয়া যাইবেন। স্বামী সদ্ভাবানন্দ শ্রীম-র অতি স্নেহভাজন। ইনি মর্টন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। মিহিজামে বিদ্যাপীঠের আরম্ভের সময় ইনি শ্রীমকে সেখানে লইয়া যান। শ্রীম-র স্নেহপীযুষপানে বিদ্যাপীঠ বর্ধিত। কয়েকমাস হইতে শ্রীমকে বিদ্যাপীঠে লইয়া যাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। তাই আজ আসিয়াছেন জোর করিয়াই লইয়া যাইবেন। অগত্যা শ্রীমও যাইবেন স্থির ছিল। কিন্তু তীব্র সর্দি হওয়ায় আর যাওয়া হইল না। বিদ্যাপীঠ ও জামতাড়া আশ্রমে কয়েক মাস থাকিবেন কথা ছিল। তাহাতেও বাধা পড়িল।

সাধুরা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীম তখন ভক্তদের বলিতেছেন, জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার রায় বাহাদুর সখীচাঁদও অনেকদিন থেকে পুরী যেতে খুব অনুরোধ করছেন। বারবার ডাকছেন লোকমারফৎ ও পত্রে। একদিকে টানছেন বৈদ্যনাথ, আর একদিকে জগন্নাথ। দেখ, কার

*আপনার মান তুচ্ছ করিয়া যিনি অপরকে মান দেন।

টান বেশী। শেষ অবধি জগন্নাথের জয় হইল। কারণ শ্রীম কিছুকাল পরে পুরী গেলেন।

রাত্রি আটটা। চারতলার সিঁড়ির ঘরে শ্রীম উপবিষ্ট চেয়ারে দক্ষিণাস্য, দোরগোড়ায়। ভক্তগণ সম্মুখে ও পাশে বসা। জগবন্ধু ছাদে বেঞ্চার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন, শরীর একটু খারাপ। শ্রীম-রও শরীর খারাপ। তিনি এতক্ষণ নিজকক্ষে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া শ্রীম থাকিতে পারেন না, ড্যান্সায় মাছের মত ছটফট করেন। হ্যারিকেন লঠনটা একজন নিচে লইয়া গিয়াছেন। তাই অন্ধকারে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কে কে এয়েছেন নাম করে বলুন। আর বাইরে কে কে?

একজন ভক্ত — বাইরে জগবন্ধু, বিনয়, সুখেন্দু ও রমণী।

শ্রীম — আর ঘরে কে কে?

আর একজন ভক্ত — বড় জিতেন, ডাক্তার বস্মী ও বলাই, আর যতীন, গদাধর ও রমণী, আর —

বড় জিতেন (কথা শেষ না হইতেই) — কাল জিতেন মহারাজ বেশ বলেছিলেন, something tangible (হাতে নাতে কিছু) না পেলে আর পারছি না।

শ্রীম — এই যে গোলমাল, এতেই তো বেশ বোঝা যায়, গুরুকৃপা হয়েছে। তা না হলে, কেন অন্যলোক তাঁকে পাওয়ার জন্য এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে না?

বড় ফুল দেরীতে ফোটে — যেমন পদ্ম। অন্য ফুল ফুটলো আর ঝরে পড়লো। কিন্তু পদ্ম ফুটতে অনেকদিন লাগে। তেমনি সুঘ্রাণ ও শোভা প্রদান করে বেশীদিন।

বড় জিতেন — আপনি সর্বদা বলেন, life simplify (জীবনযাত্রা সরল) না করলে ধর্ম হয় না।

শ্রীম — একি আর আমাদের কথা! তাঁর কথা, ঠাকুরের মহাবাক্য! তাঁর কৃপা অন্তরে বুঝতে হলে এটা হলো, preliminary requirement (প্রাথমিক প্রয়োজন)। কারণ life simple (জীবন সরল) না করলে

কি করে চলবে ও পথে? সব সময়ই যদি খাওয়াপরা়ার চিন্তা থাকে তবে ঈশ্বরচিন্তা হবে কখন? তাই এসব divine (দৈবী) সংকেত রেখে গেছেন ঠাকুর।

বলেছেন, যাদের বিয়ে হয় নাই তারা যেন আর বিয়ে না করে। Bread problem (আহারের সমস্যা) কত সহজ হয়ে গেল এতে। One hundredth part (একশ' ভাগের একভাগ) মাত্র রইল এতে — নিজের শরীরধারণের জন্য। আবার যারা বিয়ে করেছে তাদের এমন কথা বলে দিলেন যে তাদের আর বেশী গোলমালে পড়তে হলো না। বলেছিলেন, আলাদা বিছানায় শোবে আর দুই একটি ছেলেপুলে হলে স্বামীস্ত্রী ভাইবোনের মত থাকবে।

দেখ না, আমরা কি নিয়ে রয়েছি ঘরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি পেটের চিন্তা। যার অর্থ নাই সে তা সংগ্রহের চেষ্টা করছে। আর যার অর্থ আছে সে কেবল ঐ অর্থ দিয়ে পেটপূজোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠাকুর যে বললেন, ঈশ্বরদর্শন মানুষের সকলের শেষ অবস্থা — তার কি হলো? দিন তো যায়। কখন শরীর চলে যায় তার নাই ঠিক।

তাই ঠাকুর বলতেন, যারা তাঁকে চায় তারা কোনও রকমে উদরপূর্তি করে বাকী সময় ঈশ্বরের চিন্তায় ও ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত কর। আহার পোশাক পরিচ্ছদ যদি মানুষের সব সময় নিয়ে যায় তবে ঈশ্বর চিন্তা করবে কখন! এই জন্য life simplify (জীবনযাত্রা সরল) করা দরকার। যারা ঈশ্বরকে চায় না, কেবল সংসার চায়, তাদের জন্য ঐ সব অর্থ উপার্জন করা, খাওয়া পরা দেহের সুখ। যারা তাঁকে চায় তাদের মনে করতে হয়, খাওয়াটা একটা রোগ। তাই মনে করে ঔষধের মত পেটে দেওয়া খাদ্য, যাতে শরীরটা কাজ করে। তারাই ঈশ্বরের প্রিয়। আর সংসারের প্রিয় অন্য লোক।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। শ্রীম বেধে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। সম্মুখে বসা জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি ভক্তগণ। শ্রীম-র খুব সর্দি হইয়াছে।

আজ কোজাগর লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সকাল হইতেই শ্রীম-র বিশেষ ভাবান্তর। কখনও নীরব, কখনও কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মনটা দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর করছে। এইদিনে কেশববাবুর সঙ্গে ঠাকুর নৌকাবিহার করেছিলেন। আবার আর একবছর এইদিনে কেশববাবুর মা ঠাকুরকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসে আনন্দ করেছিলেন কলুটোলায়। এসব anniversary day (বাৎসরিক আনন্দোৎসবের দিন) হয়ে রইল। ভক্তরা পরে এসব লীলার অভিনয় করবে।

Mass mind (জনসাধারণের মন) এখনও ঠাকুরকে নিতে পারে নাই। পরে নেবে। যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা — এসব প্রাচীন উপায়ে জনসাধারণের নিকট পৌঁছাবে ঠাকুরের নাম। আবার নূতন উপায়ও লাগাবে প্রচারকার্যে, যেমন বায়স্কোপ, ল্যান্টার্ন শো, ইত্যাদি। হয়তো সাহিত্যিকগণ ঠাকুরকে তাদের লেখার বিষয় করবে। তখন জনসাধারণের নিকট যাবার আর এক ধাপ অগ্রসর হবে। সাহিত্যে না ঢুকলে প্রচার দ্রুত হয় না।

বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম, মুসলমান ধর্ম — এসবের এতো প্রচার কেন? না, এসব সাহিত্যে ঢুকেছিল বলে। তার ওপর রাজধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পলিটিক্সের সহায়ে প্রচার হয় সব চাইতে বেশী। আজ যদি west-এর (পাশ্চাত্যের) political power (রাজশক্তি) যায় তবে খ্রিষ্টিয়ানিটিও নিচে পড়ে যাবে।

জনসাধারণের ভিতর যে ধর্ম যায় তার রূপ একরকম। কিন্তু ভক্তের জন্য অন্য রূপ।

খ্রিষ্টিয়ানিটিও যাবে, কিন্তু ক্রাইস্ট চিরকাল থাকবেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও, সত্য ও সরলতা আশ্রয় কর — তাঁর এই সব মহাবাক্য চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর কেন যেতেন এখানে সেখানে — ব্রাহ্মসমাজাদিতে, নানাস্থানে? না, তাদের ভেতর তাঁর ভাব ঢুকিয়ে দিতে যেতেন। স্বীকার করুক বা না করুক তাঁর প্রভাব পড়বেই। কেশব ও

বিজয়কে মিলিয়ে দিতে নৌকাবিহার লীলা করলেন লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে। যত দিন যাবে তত লোকে বুঝবে এসব। এসব অভিনয় হবে পরে।

আজের লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে যে সব কথা বলেছিলেন তার সার হলো — জীব যাই কর, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কর। তবে শান্তিসুখ পাবে। এটি হলো সাধারণের জন্য উপদেশ। একথা মনে থাকে না লোকের। তাই highest ideal-টিও (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শটি) ধরলেন সামনে। বললেন, তাঁকে দর্শন কর, তাঁর সঙ্গে কথা কও, তবে জীবনের সার্থকতা পূর্ণ হলো। মানুষজীবনের এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। শুধু কি এ আদর্শটি বলেই ক্ষান্ত হলেন? তা নয়। নিজে দেখালেন — একেবারে সমাধিস্থ। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় বিমল আভা। যা বললেন তা দেখালেন নিজের জীবনে — ঈশ্বরদর্শন। বিজ্ঞানের প্রধান পূজারী ডক্টর মহেন্দ্র সরকার স্তম্ভিত নির্বাক বিস্ময়ে।

অপরূহ বেলা দুইটা হইতেই আজ ভক্তসমাগম হইতেছে। ভাটপাড়া হইতে আসিয়াছেন ললিত রায়। আর রামপুরহাট হইতে আসিয়াছেন রেস্তোর মুকুন্দ। তারপর নিত্যকার কয়েকজন ভক্ত পরপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন — যতীন ও বলাই, ডাক্তার বিনয় ও গদাধর। জগবন্ধু এইখানেই থাকেন। ভক্তগণ নানাভাবে নানারূপ আলোচনার অবতারণা করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীম নিজকক্ষে অর্গলবদ্ধ।

পাঁচটার সময় শ্রীম আসিলেন ছাদে। তাঁহার বগলে ধূতি, লাল ও সাদা ডোরাওয়ালা গামছায় মোড়া। ভক্তদের বলিলেন, নমস্কার নমস্কার। আপনারা বসুন। আমি নিচে থেকে আসছি হাত মুখ ধুয়ে। নিচে গেলেন আবার উপরে উঠিলেন। আর নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পর আবার আসিলেন বাহিরে, ছাদে। শ্রীম বসা চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ বসিয়া আছেন শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চে।

কিছুকাল শ্রীম ভক্তদের কুশল প্রশ্ন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, ভক্তগণও ধ্যান করিলেন। ধ্যানের পর আসিলেন, উপেন মহারাজ (স্বামী বিমুক্তানন্দ)। তিনি আসিয়াছেন অদ্বৈতশ্রমের জন্য পাচকের অশেষণে। তিনি চান ভক্ত সদানন্দকে পাচকরূপে। সদানন্দ এখন ডাক্তার বস্ত্রীর বাড়িতে পাচক। ভাল লোক, ভক্ত লোক। আলোচনায় স্থির হইল, ডাক্তার বস্ত্রী তাহাকে

ছাড়িয়া দিবেন। সাধুদের কষ্ট না হয়, তাহাই সকলের লক্ষ্য। এইবার অন্য কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী বিমুক্তানন্দের প্রতি) — হাঁ, কাল আমি জিতেন মহারাজকে সেই কুড়ি বাইশ বছরের ছোকরা ভেবে কথা কইছিলাম। ওমা, যখন উনি বললেন, এইটিন-এইটিসিক্সে (১৮ ৮ ৬ খ্রীঃ) আমার জন্ম তখন আমার চৈতন্য হলো। ভাবলাম করেছি কি? কত তপস্যা করেছেন! মায়াবতীতে ছিলেন আট বছর, হিমালয়ে। আবার বাঙ্গালোরে, ত্রিবাঙ্কুরে, মাদ্রাসে — কত জায়গায় কত তপস্যা করেছেন। ভাবলাম আমি কাঁকে কি বললাম।

শ্রীম-র এই আন্তরিক অমানিদ (নিরহংকারী) আর্তি দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত। আবার কেহ কেহ ঈষৎ হাস্যময়।

প্রায় সাতটায় শ্রীম গেলেন ঠাকুরবাড়ি। সেখানে লক্ষ্মীপূজা হইবে আজ ঠাকুরঘরে। ফিরিলেন রাত্রি দশটায়।

৩

ভক্তগণ সন্ধ্যা হইতে ছাদে বসিয়া আছেন। আহা, পূর্ণিমার চাঁদের কি শোভা আজ! সুযমার সৌরভে যেন পৃথিবী নিমজ্জিত। এই চাঁদ দেখিয়া ভোগীর ভোগ-ইচ্ছার বৃদ্ধি হয়। আর ভক্তের হয় ভক্তির বৃদ্ধি। ভক্তগণ ভাবেন, এই চাঁদ আমাদের অতি আপনার জন। ইনি আমাদের সহস্রশঃ নমস্য। ইনি অতীতের সাক্ষী। ইনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন। আবার পূর্বজ শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধের জীবন্ত মধুময় সাক্ষ্য। ভক্তগণ আজের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর স্মৃতিতে নিমগ্ন। এই দিনে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সহিত জাহ্নবীবক্ষে বাষ্পীয়-যানে বিহার করিয়াছিলেন।

ভক্তগণ কেহ কেহ হয়ত মানসপটে, হয়ত বা কথামৃত-চক্ষে দেখিতেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর অপরূপ সমাধিস্থ ছবি। দেখিতেছেন, জাহাজের কেবিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়ারে উপবিষ্ট — প্রিয়দর্শন, সহাস্যবদন, আনন্দময় প্রেমানুরঞ্জিতনয়ন। আবার সদা ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন জগৎভোলা সর্বত্যাগী প্রেমিক সন্ন্যাসী, এক বিচিত্র মহাযোগী।

কেহ ভাবিতেছেন, একি অদ্ভুত যোগী! লোক যোগসাধন করে নির্জনে। সিদ্ধ হলেও ঐ নির্জনেই হয় তাঁদের অবস্থান। এই ব্যক্তি, সজন নির্জন উভয়স্থানে সমান ব্রহ্মালীন। তাঁর নিকট দেখছি দক্ষিণেশ্বরের সত্ত্বময় নির্জন তপোবন আর রজের চলমান চঞ্চল নিদর্শন বাস্পীয় যান সমান। একান্ত কুটীরাভ্যন্তর আর জনবহুল স্টীমারের কক্ষ সমান। কেহ ভাবিতেছেন, কি করে এ ব্যক্তি সর্বাবস্থায় অবিদ্যার অজেয় আকর্ষণভূমি এই দুরন্ত জগৎ থেকে মনকে টেনে নিয়ে ব্রহ্মসমুদ্রে বিলীন করে দেন মুহূর্তমধ্যে। তিনি নিশ্চয় অবিদ্যার অধিপতি শ্রীভগবান হবেন। নরযোগীর অসাধ্য, সুদুষ্কর এ কাজ! নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মযোগী!

কেহ ভাবিতেছেন, আজের কোজাগর পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্ম সমাজের অতি শুভদিন। কেন না, এই দিনেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্ম আচার্য কেশব সেনকে বলেছিলেন — শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ, বেদ ও তন্ত্রের সিদ্ধান্ত এক। বলেছিলেন, অগ্নি আর দাহিকাশক্তি যেমন অভেদ, দুগ্ধ আর ধবলত্ব যেমন অভেদ, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ — ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম। হয়ত প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণী সত্যানুসন্ধী যুক্তিবাদী কেশবের হৃদয় মন অধিকার করে বসেছিল। কারণ দেখা যায়, পরবর্তীকালে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে ব্রহ্মশক্তি ‘মা মা’ নাম উচ্চারিত হচ্ছে। ব্রাহ্ম ভক্তগণ নববিধান মন্দিরে হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপক নিয়ে বিভোর হয়ে ‘মা মা’ বলে ব্রহ্মশক্তির আরতি করছেন।

মহামতি ম্যাক্সমুলার ইউরোপে বসে কেশবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। ভাবছিলেন, কোথা হতে কি করে নববিধানে এই ‘মা মা’ নাম ঢুকল! তাঁর এই সংশয় দূর হয়েছিল অনেক বছর পর, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকেশবের মিলনের কথা যখন শুনেছিলেন। আজও নববিধানের বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে একটি দিন ধার্য থাকে রামকৃষ্ণ-কেশবমিলনের এই মধুর মঙ্গলকর উদার শুভক্ষণটির অনুধ্যানের জন্য।

কেশব কি ছোট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ‘ব্রহ্মশক্তি অভেদ’ — এই প্রত্যক্ষানুভূতির উদার বাণী গ্রহণ করে? উত্তর — না কখনও না। ইহাতে কেশবের তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা, নির্মুক্ত যুক্তিপ্ৰিয়তা ও ব্রহ্মাদর্শনের ব্যাকুল

উন্মাদনাই প্রমাণিত হল। কেশব মহাপুরুষ!

কোন ভক্ত হয়তো ভাবিতেছেন, পূর্ণিমার এই দিনেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে নিজের প্রত্যক্ষানুভব — ‘যত মত তত পথ’ বাণী শুনিয়ে দিলেন। এই মহাবাণীই অতি প্রাচীনকালে ঋষিদের মুখ হতে ঋক্বেদে উচ্চারিত হয়েছিল — ‘একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।’ বলেছিলেন — যেমন, জল ওয়াটার পানি একই বস্তু — তেমনি আল্লা গড্ (God) ব্রহ্ম কালী — এক। রাম হরি যীশু দুর্গা — সব এক। সকল ধর্মপথেরই গম্য একই স্থান। পথ খালি ভিন্ন। তেমনি বিচারপথ, ধ্যানপথ, ভক্তিপথ, কর্মপথ — সকলেরই গন্তব্য স্থল ঈশ্বর!

ভক্তগণ শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। কেহ ছাদে পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছেন, কেহ সিঁড়ির ঘরে বসা। কেহ বা ছাদের উত্তর দিকের তপোবনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

ভক্তরা নানাস্থান হইতে আসিয়াছেন। শুকলাল ও মনোরঞ্জন আসিয়াছেন বেলেঘাটা হইতে। ছোট জিভেন সুখেন্দু রমণী বিজয় বসন্ত প্রভৃতি কেহ বা কর্মস্থল হইতে আসিয়াছেন, কেহ নিজ বাসস্থান হইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন ডাক্তার বক্সী, বিনয়, জগবন্ধু গদাধর ও যতীন।

সাড়ে সাতটায় আসিলেন স্বামী ওঁকারানন্দ। আটটার পর তাঁহাকে লইয়া জগবন্ধু গেলেন পঞ্চানন ঘোষ লেনে — কৃষ্ণাত্মা শুনিতে। সঙ্গে ভক্তরাও কেহ কেহ গেলেন। অনেক দিন হইতে কৃষ্ণাত্মা হইতেছে। আজও হইবে, কিন্তু দেহীতে হইবে — নয়টার পর। সাধু ভক্তরা তাই ফিরিয়া আসিলেন। পরে সংবাদ আসিল আজ আর যাত্রাগান হইবে না।

শ্রীম ফিরিলেন ঠাকুরবাড়ি হইতে দশটার পর। ভক্তগণকে শ্রীম বলিলেন, আপনারা বসে বসে ঠাকুরের চিন্তা করছিলেন তো? এই দিনে কেশবের সঙ্গে নৌকাবিহার করেছিলেন। তারপর আর একবছর, কেশবের বড় ভাই নবীন সেনের বাড়িতে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন কলুটোলায়। আহা, কি গান, কি নৃত্য — এখনও দেখছি যেন চোখের সামনে হচ্ছে। কেশব সেনকে বলেছিলেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই ভক্তকে ধরে থাকলে ভগবানের দর্শন হতে পারে। ওরা তো অবতার মানে না। তাই ইঙ্গিত করেছিলেন। ভক্তকে অর্থাৎ ঠাকুরকে ধরে থাকলে

ঈশ্বরকে পাবে। হয়েও ছিল তাই। ঠাকুরের কৃপায় কেশব ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন। আপনারা এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি যান।

এখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, মা ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশব আর বিজয়কে নিয়েছেন। তাই তিনি তাঁদের জন্য ব্যাকুল হতেন। মায়ের লোক কিনা এঁরা। বিজয়ের পয়সা নাই। তাই ভক্তদের বলতেন — নৌকো করে, বা গাড়ী করে বিজয়কে নিয়ে আসবে। আর কেশবের কাছে নিজেই যেতেন। কেশবও কখনও আসতেন। কতখানি ভালবাসা! কেশববাবুর অসুখে মায়ের কাছে ডাব চিনি মানত করেছিলেন। শেষ অসুখে দেখতে গেলেন। কেশববাবু বাড়ির ভিতর ছিলেন। ঠাকুরের তর সইছে না। বলছেন, আচ্ছা, আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসি। বলেছিলেন — মা, যদি কেশবের কিছু হয় তবে কার সঙ্গে তোমার কথা কইবো কলকাতা গেলে? আবার শরীর গেলে কেঁদেছিলেন। আর তিনদিন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তা করবেন না! কেশবই তো প্রথমে ঠাকুরকে চিনেছিলেন। বলেছিলেন, জগতে এখন অমন মানুষ নেই। তুলোর ভেতর যেমন আঙ্গুর রাখে তাঁকে তেমনি রাখা উচিত। অথবা কাঁচের আলমারিতে রাখা উচিত। কেশববাবুই তো প্রথমে ঠাকুরের অতিমানবতার কথা কাগজে লিখলেন। জহুরী নইলে কি মানিক চিনে! আদি সমাজে কেশবকে চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন, এ দৈবী মানুষ। এর ফাত্না ডুবেছে। অর্থাৎ ধ্যানে প্রায় ঈশ্বরের কাছে চলে যাচ্ছে মন।

আজের মিলন কেশব ও বিজয়ের, নৌকোবিহারে, আকস্মিক ঘটনা নয়। কুচবিহারের বিয়ে নিয়ে ছাড়াছাড়ি হয় কেশব বিজয়ের। আজ মিলন হলো। জগদম্বার ইচ্ছাতে আজের নৌকোবিহার। তাই ঠাকুর বললেন — ‘মা, আমাকে এখানে আনলে কেন, আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারবো?’ ঠাকুরের স্পর্শে উভয়ের মন, বেড়া ভেঙ্গে উর্ধ্ব উঠেছিল। কেশব ও বিজয় উভয়েই ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন।

কলিকাতা, ১লা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ।

১৫ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল, বৃহস্পতিবার।

পঞ্চম অধ্যায়

পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেওয়া

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। ভক্তগণ কেহ ছাদে, কেহ সিঁড়ির ঘরে বসা — ছোট জিতেন, সুখেন্দু, গদাধর, যতীন, জগবন্ধু, বলাই, বরদা প্রভৃতি। বরদা আর্টিস্ট, সমবায় বিল্ডিংএ তিনি থাকেন।

শ্রীম নিজ কক্ষের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। আর দরজার গোড়ায় চেয়ারে বসিলেন দক্ষিণাস্য। নমস্কারাদির পর নানা লৌকিক প্রসঙ্গ চলিতেছে — আর্ট, সায়েন্স, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্যালিকো প্রিন্টিং, এই সব।

সুখেন্দু ক্যালিকো প্রিন্টিং-এর কাজ করেন। নিজের ফ্যাক্টরী আছে। অনেক লোক কাজ করে। সুখেন্দুর শরীর ভাল নয়। সুখেন্দুকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীম কথা উঠাইলেন। কখনও কখনও ফস্টিনস্টি করিতেছেন।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — একে খারাপ শরীর, তার উপর এই সব কাজের চিন্তা। আচ্ছা, আপনি খান না কেন? খাওয়া খুব ভাল। আর ভাল ভাল সব খাবেন। বলে, সব জড়। কিন্তু কিছুই জড় নয়। সব spiritual (চেতন), সব চেতন্যময়। এই ফলটলগুলি সব চেতন্যময়। তাই উপনিষদে (তৈত্তিরিয়ে) বলেন, অন্ন ব্রহ্ম — ‘অন্নং ব্রহ্ম ব্যাজানাৎ’। অর্থাৎ অন্নকে ব্রহ্ম বলে জানবে। আবার, ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সব ব্রহ্ম। বলেছেন, ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’। সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম।

খান, খান, ভাল ভাল জিনিস খান। তবে তো দেহে জোর আসবে। অন্নব্রহ্ম দ্বারা দেহব্রহ্মকে রক্ষা করা। মন বুদ্ধি আত্মা সবই খাওয়া থেকে শক্তি পায়।

যা হজম হয় তা খুব বেশী করে খান। সব রস খেতে হয়। কটু-তিক্ত-কষায়, লবণ-অন্ন-মধুর—এই ষড়বিধ রস খেতে হয়। আবার চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়, সব রকম খেতে হয়।

(সহাস্যে) নিজে তো আর খাচ্ছেন না। সেই আত্মাকে খাওয়ান হচ্ছে। তাই পাঁচ রকম খাদ্য জোগাড় করে খাবেন। তাতে আত্মা তুষ্ট থাকবেন।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — প্রথমটা অবশ্য হয় না তা আবার অভ্যাস করতে করতে হয়ে যায়। প্রথমটা মনে হয়, আমি খাই। তারপর অভ্যাস করতে করতে হয়ে যায় — আত্মা খান।

গোপালকে লোক পাঁচরকম ভোগ দেয় কেন? তেমনি আত্মাকেও দিতে হয়। ব্যাসদেব বললেন, আমি যদি না খেয়ে থাকি, তবে হে যমুনে, তুমি দুই ভাগ হয়ে যাও। গোপীদের রাস্তা করে দাও। অমনি যমুনা হয়ে গেল দু'ভাগ। এই দেখে গোপিনীরা আশ্চর্যাস্থিত হয়ে গেল। এদিকে গণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছেন। যত সব ক্ষীর-সর-দধি ছিল গোপিনীদের, সব সাবাড় করে দিলেন। আবার বলছেন আমি খাই নাই। এমনি সব কাণ্ড!

গদাধর — তবে যে সেদিন বললেন, 'বমনাহারবৎ' ইত্যাদি?

শ্রীম — সে তো প্রবর্তকদের জন্য। যারা সবে আরম্ভ করেছে ধর্মাচরণ। ও-ও, তুমি বুঝি এই মানে করে বসে আছ?

মানুষের মধ্যে কত রকম আছে। স্থূল, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আবার সিদ্ধের সিদ্ধ। প্রবর্তকরা 'এ না, ও না' করে ছাড়বে। যাদের অনেক সাধুসঙ্গ হয়েছে তাদের কথা আলাদা। যাঁরা ছাদে উঠেছেন, অর্থাৎ সিদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁরা দেখেন যে জিনিসে ছাদ তৈরী সেই জিনিসে সিঁড়িও তৈরী।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — আপনাদের তো হয়েই আছে। এতো সাধুসঙ্গ, এতো সাধুসেবা! এই যে উৎসবটি (দুর্গাপূজা) গেল মঠে — রাত্রিবাস, রাত্রি জেগে সেবা — একি অন্যের ভাল লাগবে?

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই ঠাকুর বলেন, শাস্ত্র গুরুমুখে শুনতে হয়। আমরা যে একটু বুঝেছি সে কেবল তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে ছিলাম বলে। অধিকারী ভেদের কথা আছে শাস্ত্রে।

মোহন — সকলেই তো শাস্ত্র গুরুর কাছে পড়ে, গুরুমুখে শোনে?

শ্রীম — না, এখানে 'গুরু' মানে অবতার। ঈশ্বরই মানুষ হয়ে আসেন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে। যেমন ঠাকুর।

মোহন — সকলের তো সে সুযোগ হয় না। তারা কি তা হলে শাস্ত্র পড়বে না?

শ্রীম — হাঁ, পড়বে যদি ইচ্ছা হয়। তবে অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। যেখানে মিললো নিলাম। যেখানে মিললো না, তা ছেড়ে দিলাম। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশান থাকে। পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু আলাদা করতে হয়। সে কাজ পারেন গুরু, অবতার।

শাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্য কি? না, জানা — মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঈশ্বরদর্শন, এইটে। তা যদি গুরুবাক্যে বিশ্বাস করলে হয়ে যায়, তবে কেন পড়া? বিশ্বাস না হলে গুরুবাক্যে, গুরুমুখে শাস্ত্র শোনা। ঠাকুর বলেছিলেন, পড়ার চাইতে শোনা ভাল। শোনার চাইতে দেখা ভাল। অত সহজে হয়ে গেলে কে যায় অত ঘুরতে? একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঠাকুরকে একদিন দুপুর বেলায়, উপায় কি? তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

মোহন — তাহলে লোক শাস্ত্র পড়ে কেন?

শ্রীম — কেউ পড়ে পণ্ডিত হতে। তা দিয়ে জীবিকার্জন হয়, নাম যশ হয় এতে। কেউ পড়ে ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে সহায়করূপে। শাস্ত্রের দু'টো দিক আছে — শব্দার্থ আর মর্মার্থ। যারা ঈশ্বরকে চায় তারা মর্মার্থ নেয়।

মুণ্ডক-উপনিষদে শৌনকের কথা আছে। আবার নারদের কথা আছে ছান্দোগ্যে। শৌনক ছিলেন নৈমিষারণ্য গুরুগৃহের চ্যান্সেলার, আচার্য। দশহাজার বিদ্যার্থী সেখানে থাকতো। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। কিন্তু চিন্তে শান্তি ছিল না। তাই পিপ্পলাদ ঋষির কাছে গেলেন শান্তির জন্য। তিনি বললেন, তুমি এতদিন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলে। তাই শব্দার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। তাই শান্তি হয় নি। শাস্ত্র শান্তির স্থান শ্রীভগবান। তাঁকে জানলে শান্তি হয়। তারপর তাঁর উপদেশে তপস্যা করে ভগবানকে জানেন! তখন শান্তি।

নারদেরও তাই। যত জ্ঞান আছে সব লাভ করেছিলেন — নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, দেববিদ্যা আদি। চিন্তে শান্তি ছিল না। তখন অশান্ত মনে ঋষি সনৎকুমারের কাছে যান। বললেন, ঋষিদের মুখে শুনেছি জ্ঞানলাভে শান্তি হয়। কিন্তু অত জ্ঞান লাভ করেও আমার শান্তি নাই কেন? ঋষি

বললেন, তুমি শব্দজ্ঞান লাভ করেছ। তাতে শান্তিলাভ হয় না। মর্মজ্ঞান লাভ করলে শান্তি। ঋষির উপদেশে মর্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে শান্তি লাভ করলেন।

ঠাকুর নিশারাত্রিতে অনাহত শব্দ শুনতেন। বাহ্য যত শব্দ সব আহত হয়ে উৎপন্ন হয়। (মেঝেতে আঘাত করে) এইটে আহত শব্দ। এর উৎপত্তি মাটি, হাওয়া, আঘাত—এসব মিলে হচ্ছে। অনাহত শব্দ এরূপ নয়। এই অনাহত শব্দই ব্রহ্ম। সদা এই শব্দ হচ্ছে — যোগীরা শুনতে পান। এই অনাহত শব্দের জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই মর্মার্থ। শব্দ ধরে চলে ও শেষে ব্রহ্মে উপস্থিত হয়।

২

মোহন — পণ্ডিতদের কেবল শব্দার্থজ্ঞান লক্ষ্য করেই কি ঠাকুর বলেছিলেন — চিল শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে?

শ্রীম — হাঁ। ‘ভাগাড়ে’ মানে, ভোগে — কামিনীকাঞ্চনে। তপস্যা চাই। সাধন তপস্যা ছাড়া কামক্রোধাদি রিপু কি করে বশীভূত হবে? তাই তিনি বলেছিলেন, বিবেক বৈরাগ্যহীন পণ্ডিতগুলোকে খড়কুটোর মত মনে হয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত কালীপূজো করছিলেন কামারপুকুরে। আমরা সেখানে উপস্থিত। বললেন, তুমি নাকি লেখাপড়া শিখেছ? কিন্তু কি করে গদাইয়ের শিষ্য হলে? গদাই তো শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ে নি। আমরা তখন ঠাকুরের কাছে যা শুনেছিলাম, তাই দু’চারটে কথা ছেড়ে দিলাম। বলেছিলাম, তাঁর (ঠাকুরের) মুখে শুনেছি, ‘চিল শকুন খুব উঁচুতে ওঠে। কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে, কামিনীকাঞ্চনে।’ ‘আমার হলে পণ্ডিতের দরকার নাই।’ ‘বিবেক বৈরাগ্যহীন পণ্ডিতকে খড়কুটোর মত মনে হয়।’ পরে শুনেছিলাম, এরপর থেকে ঐ পণ্ডিত ঠাকুরের ভক্ত হয়।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — যে জিনিস ভাল, অপপ্রয়োগে তার খারাপ ফল হয়। যে বিষে প্রাণরক্ষা হয়, অপপ্রয়োগে তাতে প্রাণহানিও হয়।

অভিজ্ঞ লোকের কাছে তার প্রয়োগবিধি শিখতে হয়। দেখ না, শংকরাচার্য — যেমনি জ্ঞানঘন মূর্তি, তেমনি শাস্ত্রমূর্তি — তিনি কি বলছেন। বলেছেন, ‘শব্দজালমহারণ্যং চিন্ত্রমণ কারণম্’। আবার সাধনহীন তপস্যাহীন শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশলকে বলছেন, বিষয়ভোগের সাধন। মুক্তির সাধন নয় — ‘তদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।’

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। এইবার ধর্মাচরণের ব্যবহারিক রূপটি তিনি দেখাইতেছেন।

শ্রী (সুখেন্দুর প্রতি) — ভাইদের উপর দিন না ভার। এরা এখন করুক। আপনি অনেক করেছেন। এখন বিশ্রাম নিন্। (ভক্তদের প্রতি) — প্রবৃত্তি is alright (ভাল) যদি এতে ‘জান্’ না যায়। সব উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন জান্ নিয়ে টান পড়ে, তখন আর তা উড়িয়ে দেবার যো নাই। এমনি জিনিস জান।

এই শরীরটিতে সোনা গালাতে হবে। সোনা গালান হয়ে গেলে তখন যায় যাক্ — তবে পারে। যতদিন তা না হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন না হয়, ততদিন তাকে যত্নে রাখতে হয়। এই শরীরকে অধিক যত্নে রাখলেও বিপদ, আর যত্ন না নিলেও বিপদ। তাই ঠাকুরের ব্যবস্থা, ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে মধ্যপস্থা গ্রহণ করা।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — এ (বিষয় কর্ম) কি কম হ্যাঙ্গাম! কাশী যাওয়া, তীর্থ করতে যাওয়া, এতে মন সুস্থ থাকে। আর এ কোথায় কারিগর, কোথায় অমুক।

অনেক তো করেছেন। এবার নিবৃত্তিই ভাল। আচ্ছা, না ছাড়তে পারা যায় — শরীরটা আগে ভাল হোক, তারপর যা ইচ্ছা করবেন। অবসর নিন্।

শ্রীম নীরব। পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তিনিই খাদ্য। আবার এক জায়গায় বলেছেন, খাওয়া কাজটাও তিনি। সবই তিন — খাদ্য খাদক খাওয়া সব তিনি — ‘ব্রহ্ম কর্মসমাধিনা’ (গীতা ৪-২৪)।

যদি বল, যদি তিনিই অন্তরে বাহিরে সব, তবে তপস্যা কেন? তার উত্তর — এইটিই বুঝবার জন্য তপস্যা দরকার। গুরুমুখে হয়তো শুনেছে। তা সব কি তার বিশ্বাস হয়? কারও কারও এক জন্মেই হয়ে যায়। কারও

কারও হয়তো পঞ্চাশ হাজার জন্মে হয়। কি আরও বেশী। এমনি প্রকৃতি তিনি করেছেন।

যেমন, জল নামছে। একটা বাঁধ আছে। এতে এসে আটকে পড়ে। এই বাঁধটা ভেঙ্গে দেবার জন্যই তপস্যা। বাঁধ ভাঙ্গলে অমনি জল সব ছুঁ করে নেমে গেল।

যাকে লাভ হলে আর কিছুই লাভ বাকী থাকে না, সেইটির জন্যই তপস্যা।

যং লক্ষ্মা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ গীতা ৬।২২

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — এই কথায় ঠাকুর বলতেন, অনেক তো করেছে। এইবার তাঁর চিন্তা কর, দুটি ডালভাতের যোগাড় ক'রে।

আপনার তো কোনও প্রতিবন্ধক নাই। তবে কেন? যাদের সংসার আছে, না করলে নয়, তারা করুক। এতে শক্তিক্ষয় হয়। যে শক্তি অন্য ভাল কাজে লাগতো সেই শক্তি ক্ষয় হচ্ছে।

মানুষগুলি যখন উৎসাহের সঙ্গে এদিককার (সংসারের) কোনও কাজ করে তখন তাদের শক্তির ক্ষয় হয় — শক্তির বাজে খরচ হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এদের কিন্তু — এতো সাধুসঙ্গ করেছে। আগে একবছর তপস্যা করে এসো, ঋষিরা বলতেন। একবছর তপস্যা করে এলে তখন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তা না করলে যে ধারণা করতে পারবে না।

ঠাকুর জমিটি তৈরী দেখলে, দু'টি একটি কথা ছেড়ে দিতেন। ইহা বীজের মত কাজ করতো। এই যে বাবুরা লেকচার দেয় — এ যেন আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে। তা কারো গায়ে লাগলো না। কিন্তু তাঁর তো এরূপ হবার যো নেই। ঠাকুর দু'টি একটি কথা বলতেন। তাতেই কাজ হয়ে যেতো।

শ্রীম (বরদার প্রতি) — ওখানে (বেদান্ত মঠে) গিছিলেন?

বরদা — তারপর গিয়ে শুনি, উনি (স্বামী অভেদানন্দ) দার্জিলিং চলে গেছেন।

শ্রীম — ওঁর পা-টা নাকি মাঝে মাঝে ফুলছে। বড় শীত যে দার্জিলিংএ।

ওদেশ (আমেরিকা) থেকে চলে এসেছেন ঐ জন্যই নাকি। ডাক্তাররা বললেন, শীতপ্রধান দেশে আর থাকো না। তাই তল্লিতল্লা গুটিয়ে চলে এসেছেন ওদেশ থেকে।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (স্বগত) — 'ye shall have its reward — যেমন ভাব, তেমনি লাভ।

সুখেন্দুকে সাবধান করিতেছেন কি?

শ্রীম নিচে নামিতেছেন তিনতলায়। আহার করিবেন। সাড়ে আটটায় আহার শেষ করিয়া পুনরায় উপরে আসিলেন। যোগেনবাবু পুরীধাম হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার মারফৎ লক্ষ্মীদিদি শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যোগেনবাবু শ্রীম-র জামাতা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, পুরী যেতে বড়ই সাধ হয়! ওখানে গেলে আর পালাবার ভয় থাকে না। চৈতন্যদেব ছিলেন অতকাল। ভক্তের পক্ষে বড়ই ভাল স্থান।

যোগেন — গস্তীরা, বস্তুতই গস্তীরা। ভগবানে লগ্ন হয়ে যায় ওখানে। উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না। সংসারের কথা মনে থাকে না।

শ্রীম — এই আছে একরকম (ভাব)। আবার antiquarian-দের (পুরাতত্ত্ববিদদের) আলাদা রকম। এই মন্দির চারশ' বছরের কি না — এই সব (প্রশ্ন)। ভক্তরা তা দেখবে না। তারা ভাবে, চৈতন্যদেব ঐ গস্তীরায় ছিলেন।

ডাক্তার বক্সী — গঙ্গা নেই, এই অসুবিধা।

শ্রীম — কেন, সাগর রয়েছে — 'সরসামস্মি সাগরঃ' (গীতা-১০-২৪)। আর কি? 'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী' (গীতা-১০-৩১)।

(ভক্তদের প্রতি) তীর্থ মানে কি? না, যেখানে গেলে ভগবানের উদ্দীপন হয়। তা, যার কাছে গেলে তাঁর উদ্দীপন হয় সেখানেও তীর্থ। যেমন ভক্তদের, আপনাদের দেখলে ভগবানের উদ্দীপন হয়। তা, সে-ও তীর্থ। আপনারা তো জানেন না, কত বড় লোক আপনারা।

ঠাকুর বলেছেন, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' অন্য জীবেও তিনি আছেন। তবে যে জানতে পেরেছে যে তিনি আছেন হৃদয়ে, তাকেই

বলে ভক্ত। অন্য লোক তা জানতে পারে না। তাই জৈনেরা মহাপুরুষদের তীর্থঙ্কর বলেন — অর্থাৎ যিনি তীর্থ করেন। ‘তীর্থী কুব্ধন্তি তীর্থানি’ — এ ভাগবতের কথা (১।১৩।৮)। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন।

ডাক্তারর বক্সী — যে সর্বদা যোগে আছে সে-ই তো ভক্ত!

শ্রীম — হাঁ। আপনি ভাবছেন, আমি বড় ভক্ত, অমুক ছোট। কিন্তু তিনি একটু ঘুরিয়ে দিলে, যাকে ভাবছেন ছোট, তাকে হয়তো পঞ্চাশ হাত এগিয়ে দিলেন। তাই ছোট বড় বলার যো নাই। বাইরের কাজ দেখেও বোঝা যায় না। তিনি যে কর্তা।

কলিকাতা, পুরাতন রামকৃষ্ণ সমিতির বাড়ি।

৭ নম্বর শংকর ঘোষ লেন।

২রা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৬ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল।

শুক্রবার, কৃষ্ণ প্রতিপদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চৈতন্যদেবের লীলাভূমি পুরী

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। ভক্তগণ — ছোট জিতেন বিনয় ও জগবন্ধু, যতীন, বলাই ও সুখেন্দু, মনোরঞ্জন ও গদাধর প্রভৃতি গিন্ধীমার (শ্রীম-র ধর্মপত্নী) জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আজ ঁপুরীধাম হইতে ফিরিবেন। সঙ্গে ছোট অমূল্য।

এখন সকাল সাতটা। শ্রীম চারতলা হইতে দ্বিতলে নামিয়া আসিতেছেন। কিছুক্ষণ পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় উপরে উঠিতেছেন। আর অতি আনন্দে ভক্তদের বলিতেছেন, আপনারা সেই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ হয়ে থাকুন।

আজ ৩রা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৭ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল, শনিবার।

সাড়ে সাতটায় আসিলেন গিন্ধীমা, সঙ্গে ছোট অমূল্য। দ্বিতলের সিঁড়ির গোড়ায় ভক্তগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা ও নমস্কার করিলেন। গিন্ধীমা ত্রিতলে আরোহণ করিলেন।

ছোট অমূল্য ভক্তদের ঁজগন্নাথের তুলসী ও চন্দন-প্রসাদ দিতেছেন। ভক্তগণ দ্বিতলের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর আনন্দে ‘খুড়ো’র (ছোট অমূল্যের) সহিত রঙ্গরস করিতে লাগিলেন। ছোট অমূল্যের বয়স পঁয়ত্রিশ হইবে। বিবাহিত। ঘরে মা স্ত্রী ও একটি কন্যা। হগ্ মার্কেটে দোকান ছিল। আর কলিকাতায় একটি ছোট বাড়ি আছে। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব নাই। ইদানীং সাধনভজন ও সংসঙ্গ করেন। বড়ই মধুর ভাষী ও মধুরব্যবহারী। শাস্ত্যভাব ভগবৎপরায়ণ, শ্রীম তাঁহাকে তাই সত্বগুণী মানুষ বলেন। আর তিনি ভক্তদেরও অতি আদরের ‘খুড়ো’। সুখেন্দু এক টাকার রসগোল্লা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া ‘খুড়ো’কে উপহার দিলেন।

শ্রীম-র শিক্ষা, তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রার পূর্বে ও পরে সেবা করিতে হয়। তাহাতে ভক্তিলাভ হয়। ‘খুড়ো’ ভক্তদের সঙ্গে ঐ প্রসাদী মিস্ট্রান ভক্ষণ করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে ‘জগন্নাথধামের সংবাদ বলিতেছেন।

ভক্তগণ ছোট অমূল্যকে লইয়া চারিতলায় গেলেন। তিনি শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন। শ্রীম সংবাদ পাইয়া সিঁড়ির ঘরে আসিয়া অমূল্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অমূল্য শ্রীম-র পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

একজন ভক্ত (স্বগত) — কত যাত্রী তো জগন্নাথধাম হইতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের দেখিয়া একদপ আনন্দ হয় না কেন? এখনই বা কেন আমাদের এই আনন্দ হইতেছে? আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান তো সকলের ভিতরই রহিয়াছেন, শাস্ত্র বলেন। অন্য সময় তাহা হইলে উহার অনুভব হয় না কেন? এখনই বা সেই অনুভব অত প্রগাঢ় ও হৃদয়স্পর্শী কেন? শ্রীম-র সান্নিধ্যে কি তাহা হইতেছে? শ্রীম যে শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। তাঁহার হৃদয়কমলে আনন্দস্বরূপ জাগ্রত ও জীবন্ত হইবেন নিশ্চয়। আর অমূল্য কি ‘জগন্নাথ দর্শন করিয়া জগন্নাথময় হইয়া গিয়াছেন? তাই কি শ্রীম অমূল্যের শরীরে ‘জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিলেন?

শ্রীম-র মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর একবার শ্রীমকে ‘জগন্নাথদর্শনে পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবে। রথের পূর্বে ‘নবযৌবনের’ সময় সর্বসাধারণের আলিঙ্গনের সময়। তখন অসময়। কিন্তু ঠাকুরের কথায় ও কৃপায় অসীম সাহস করিয়া শ্রীম জগন্নাথকে বেদির উপর চড়িয়া আলিঙ্গন করিলেন। ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর শ্রীমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, এই আমারও জগন্নাথকে আলিঙ্গন করা হল।

শ্রীম অমূল্যের নিকট হইতে পুরীর সকল সংবাদ লইতেছেন। আরতি দেখিয়াছিলেন, আনন্দবাজারে কণিকামাত্র মহাপ্রসাদ কুড়াইয়া খাইয়াছিলেন, মন্দিরের বিশাল অঙ্গনে বিমলাদেবী ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতিকে দর্শন পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়াছিলেন — এইসব কথা হইতেছে। আর ঠাকুরের পূর্বাভার চৈতন্যদেবের পুণ্যনাম-সংশ্লিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহের দর্শনের কথাও বলিলেন — গঙ্গীরা, টোটা গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, হরিদাস মঠ প্রভৃতি। আর

ঠাকুরের ভক্তগণের — রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতির আবাসস্থল, বলরামবাবুর শশীনিকেতন, শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থান, ক্ষেত্রবাসীর মঠ, লক্ষ্মীদিদির আশ্রম, জটিয়াবাবার মঠ আদি নবীন তীর্থস্থান সমূহেরও দর্শনের কথা হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে গিন্ধীমা জগন্নাথের টাটকা মহাপ্রসাদ ‘আটকে’ করিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ ছাদে পঙ্গদ করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া অতি উল্লাসে বলিতে লাগিলেন — আহা, এ স্থানটি যেন শ্রীক্ষেত্র আজ।

রাত্রি সাড়ে আটটা। দ্বিতলের বারান্দা। ভক্তগণ, শুকলাল ও মনোরঞ্জন, বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, বলাই যতীন ও গদাধর, ডাক্তার ও বিনয়, এটর্নি বীরেন ও জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। শ্রীম ঠাকুরবাড়ি গিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিলেন নয়টায়। বড় জিতেন ও ছোট জিতেন কোনও কার্যে চলিয়া গিয়াছেন শ্রীম-র আসিবার পূর্বেই। শ্রীম খুব ক্লান্ত। সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এইবার বারান্দার পূর্বধারে গিয়া চেয়ারে বসিলেন। আর ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কর্মে থাকলে বুঝি মন তত স্থির হয় না? ডাক্তার বঙ্গী (ব্যগ্রভাবে) — বাবা, কর্মে আবার মন স্থির! সর্বদাই বের হয়ে যাচ্ছে ঐ পথ দিয়ে।

শ্রীম — না। প্রেম হলে এর (প্রেমের) ভিতর দিয়ে (মন) বের হয়। এ অবস্থায় মনের বাজে খরচ হয় না। এ অবস্থায় কখনও চঞ্চল হলেও (মন) যোগদ্রষ্ট হয় না। আর শরীরটা যতদিন আছে, ও তো হবেই। এমন যে অবতারপুরুষ (ঠাকুর) তিনিই দেখিয়ে গেলেন, এসব ছাড়বার যো নেই! নিজের শরীরটাকে দেখিয়ে বলতেন, ‘এর ভিতর সব আছে’। বলেছিলেন, ‘বিষয়ের মেঘ উঠবেই। আবার নামবে।’

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখন যারা জন্মেছে, তাদের ভাবনা কি? মনে কর, অবতার এসে সব broadcast করে (চতুর্দিকে ছড়িয়ে) গেছেন।

অন্যে যে truths (সত্যসমূহের) একটা সারা জীবনে উপলব্ধি করতে পারে না তিনি ঐ সব উপলব্ধি করে broadcast করে (জগৎময় ছড়িয়ে) গেছেন।

শ্রীম আবার নীরব। আবার কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বাঙ্গালীরা বড়ই সৌভাগ্যবান! বাবুরা তো জানে না কেন? এদেশে যে অবতার জন্মেছেন! দেখ, দুইবার (চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ) অবতার এলেন।

World-এর (জগতের) মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। আর তার মধ্যে বাংলাদেশ। এখন চোখও বুজতে হবে না, আর পাতাও উল্টাতে হবে না। এমনি হয়ে যাবে।

ডাক্তার বক্সী — কি করে?

শ্রীম — তাঁর ideal-গুলি (আদর্শগুলি) চিন্তা করলেই হবে। আর সেইগুলি দেখা। সেইগুলি রূপ নিয়েছে কিনা মানুষে!

যেমন সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ ছাড়া ধর্ম হয় না। তাই সাধু তৈরী করেছেন তাঁর ideal-এর (আদর্শের) মত।

বলেছেন, যার কাছে বসলে ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — এ বোধ আপনিই এসে যায়, সে-ই সাধু। এইরূপ সাধু ঠাকুর নিজে তৈরী করে গেছেন। আবার গৃহস্থও তৈরী করেছেন। তারা যেন বড়লোকের বাড়ির ঝি! তাদের সঙ্গে মিশলেও মনে হবে আপনিই — ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য। এরাও সাধু। প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা বেশীর ভাগই এইরূপ ছিলেন — যেমন ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি।

ঠাকুর সবই করে গেছেন। এখন কেবল সেগুলি চিন্তা করলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না। যেমন বামনকে উঁচু টিপির উপর বসিয়ে দিলে সে সব দেখতে পায়, তেমনি। তাঁর দেওয়া আদর্শগুলি চিন্তা করলেই মন ঐ আদর্শের সঙ্গে উঁচুতে উঠে যায়। এ যেমন, বাপ রোজগার করে গেল, ঐশ্বর্য ছেলে ভোগ করে।

তাই বলেছিলেন, তাদের কিছু করতে হবে না। শুধু জানলেই হবে, আমি কে আর তোরা কে? মানে ঠাকুর অবতার আর আমরা তাঁর সন্তান।

আবার প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন — মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা

করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তিসুখ প্রেম সমাধি। আপনারা এইসব message of hope (আশার বাণী) চিন্তা করতে করতে ঘরে যান।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। ভক্তরা বিদায় লইতেছেন প্রণাম করিয়া। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া শ্রীম বীরেনকে বলিতেছেন, জগন্নাথ টানছেন দেখছি। যেতে হবে শীঘ্র। জোর ডাক এসেছে।

২

মর্টন স্কুলের ছাদ। রাত্রি সাতটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীম-র পুরী যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী পরশু রওনা হইবার কথা। তাই এখন জগন্নাথ-পুরীর উদ্দীপন, পুরীর আলাপন।

আজ ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে তিনদিকে বসিয়া আছেন বেঞ্চে। বড় জিতেন ও ছোট জিতেন, ডাক্তার বিনয় ও সুখেন্দু, যতীন, রমণী ও দুর্গা মিত্র, এটর্নি বীরেন ও মানিক, মনোরঞ্জন, গদাধর ও জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ দুর্গা মিত্র ও বড় জিতেনের সঙ্গে পুরীর আলোচনা হইতেছে। বীরেন বলরামবাবুর বাড়ি হইতে পত্র আনিয়াছেন, পুরীতে তাঁহাদের বাড়ি শশীনিকেতনে শ্রীম-র থাকার জন্য। শ্রীম যেন মনোরথে পুরী চলিয়া গিয়াছেন, যেন সমগ্র পুরীধামটি মনের সম্মুখে দেখিতেছেন। তাই তাহারই কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ওখানে সবই বিরাট — সমুদ্র, জগন্নাথ আর বিস্তীর্ণ আকাশ। জগন্নাথের নিত্য ভোগরাগের ব্যাপারটি দেখলেও বিরাটের কথা মনে হয়।

ঘরে কোন পূজা অর্চনা হলে লোক অস্থির হয়ে যায়। কত দ্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায়। আর ওখানে সাতবার ভোগ নিত্য। কোন কোন ভোগের মহাপ্রসাদে পাঁচ হাজার, দশ হাজার লোককেও খাওয়াতে পারা যায় মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ব থেকে ব্যবস্থা করলে। আবার ছাপ্পান

প্রকারের দ্রব্যে নিত্য ভোগ হয়। সবই নিত্য নূতন তৈরী হয়। নিত্য নূতন হাঁড়িতে রান্না। দু'বার কোনও হাঁড়ীতে রান্না হবে না। তার জন্য কয়েকশ' ঘর কুমোর রয়েছে। তাদের বৃত্তি সব হাঁড়ী যোগান। আবার শোনা যায়, তিন শ' ব্রাহ্মণ নিত্যসেবায় যোগদান করে, কোন না কোন প্রকারে। আবার ষোলটি গ্রাম আছে ব্রাহ্মণদের জন্য দান। সেবা পূজা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠলে এই ষোলশাসনী ব্রাহ্মণেরা তার সমাধান করে। এ তো হল আদি পর্ব।

মধ্য পর্ব দেখ। কত ভক্ত সাধু মহাত্মা সেখানে বাস করছেন। শোনা যায় সেখানে সাতশ' মঠ, সব সম্প্রদায়ের। আবার কি সুন্দর ব্যবস্থা! এই সব তীর্থবাসীরও মঠে রান্নার দরকার নাই। সব রান্না হয় Lord of the Universe-এর (জগন্নাথের) রন্ধনশালায়। রন্ধনশালাটি দেখলে বিস্ময় হয়। সুপকারগণ স্নান করে, হবন করে তবে রান্নায় যোগদান করে। সকলের মুখ কাপড়ে বাঁধা যাতে নিষ্ঠীবন দ্বারা ভোগ্যবস্তু অপবিত্র না হয়। কি সুন্দর দৃশ্য — হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী, তার উপর হাঁড়ী — চাল ডাল তরকারীর। নিচে চালের হাঁড়ী, তার উপর ডাল। তার উপর তরকারী। একটা হাঁড়ীতে দশসের বা তারও অধিক চাল সিদ্ধ হতে পারে। লবণ মশলা কিছুই না। একেবারে সুসিদ্ধ দ্রব্য। খাদ্যপ্রাণের একটুকুও নষ্ট হয় না ভেজালে। অতি পবিত্র ও পুষ্টিকর খাদ্য! এ থেকেই আজকালের কুকারের সৃষ্টি হয়েছে শোনা যায়।

এই ছাপান্ন প্রকারের ভোগদ্রব্যে মিষ্টান্নই বা কত! এ সবই নিত্য তৈরী হয়। ভোগে কোনও বাসী দ্রব্য লাগে না। তারপর কলা ইত্যাদি ফল, মাখন, কত কি!

ব্যবস্থা ছিল, তিন শ' টাকা দিলে একজন সারা জীবন এক হাঁড়ী ভাত, এক হাঁড়ী ডাল ও এক হাঁড়ী তরকারী পাবে। দেখেছি, এতে দু'জন লোকের পুরো খাদ্য থাকে। এটা সব চাইতে কম টাকার ব্যবস্থা। পাঁচ হাজার টাকা জমা দিলে একজন লোক ছাপান্ন প্রকার ভোগের দ্রব্য পাবে সারাজীবন। এসব ব্যবস্থা ছিল যাতে সকল স্তরের ভক্ত ও সাধু নিশ্চিত মনে শ্রীক্ষেত্রে বাস করে ঈশ্বরভজন করতে পারে সারাজীবন।

এবার অন্ত্য পর্ব। কত শত সহস্র সাধু ও ভক্ত সেখানে বাস করছেন

কত যুগ ধরে। কতজন ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আর জন্ম-মরণ-চক্রের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন। নানা রকমের সাধু, নানা রকমের ভক্ত।

পুরীর কথা মনে হলে আমাদের মনে প্রথমেই ওঠে চৈতন্যদেব ও তাঁর গোষ্ঠীর কথা। গর্ভধারিণীর আদেশে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে চব্বিশ বছর পুরীতে ছিলেন। এর মধ্যে তীর্থাদিতে ছয় বছর কাটিয়েছেন ভারতভ্রমণে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও হয়েছে তাঁর ভাব। কিন্তু organised (কেন্দ্রীভূত) ভাবে হয় নাই বলে তাঁর নাম নাই। কিন্তু তাঁর ভাব তৎকালীন ভারতীয় ধর্মকে উদ্দীপিত করেছিল। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন গুরু নানক। পাঞ্জাবে তাঁর ভাব কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বলে তাঁর ভাবের সঙ্গে তাঁর নামের অত প্রচার। চৈতন্যদেব ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাই তাঁর ধর্ম পণ্ডিতসমাজে পরিজ্ঞাত। নিত্যানন্দের প্রচারে mass-এ (জনসাধারণে) তা পৌঁছেছে। আর গুরু নানক ছিলেন কেবল অনুভবী — পাণ্ডিত্য ছিল না তাঁর চৈতন্যদেবের মত। তাঁর প্রচারের অঙ্গ ছিল গান আর সারঙ্গ। তাই কথা জনসাধারণে প্রবেশ করেছে অত। চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রচারের অঙ্গ ছিল নামসংকীর্তন। এর সাহায্যে জনসাধারণ তাঁর ভাব কতক গ্রহণ করে। নবাগত প্রবল মুসলমান ধর্মের স্রোত এই দুই মহাপুরুষ অনেকটা প্রতিরোধ করেন। শোনা যায়, দক্ষিণে রামেশ্বরে একটি মন্দির আছে — নাম ‘হরিবলা’ রাক্ষসের মন্দির। কেউ কেউ অনুমান করেন, এটা চৈতন্যদেবের হবে। তিনি ভাবাবেশে উন্মাদবৎ হয়ে যেতেন, কখন একেবারে জড়প্রায় হতেন। তাতেই হয়তো রাক্ষস বলে। ‘রাক্ষস’ মানে মায়াবী — নানা রূপধারী।

চৈতন্যদেব আঠার বছর পুরীতে ছিলেন। তার মধ্যে শেষের বার বছর মহাভাবে লীন থাকতেন। মহাভাব দুর্লভ জিনিস — ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে থাকা ভাবে, লীলায়। নির্বিকল্প সমাধিতে নামরূপ থাকে না — নুনের পুতুল সমুদ্রে মিলে এক হয়ে যায়।

মহাভাব আর নির্বিকল্প সমাধি দু’টিই ভাববস্তু, অস্তিত্ববাচক। তাই উপনিষদে (কঠ) আছে, ‘অস্তি’ বলে জানবে নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্মকে। অগ্রসর হয় ‘নেতি নেতি’ বলে, নামরূপে সব negate করে (নাই বলে)

যায়, কিন্তু শেষটা 'ইতি' — ঠাকুর বলতেন। মহাভাবের approach (অগ্রসর) 'ইতি ইতি' করে হয়। শেষটায় তাই 'ইতি'র লেশ থাকে। 'ইতি' অর্থাৎ ভাবের শেষ, অস্তিত্ব থাকে। উহা প্রেমস্বরূপ নির্বিকল্পের শেষ জ্ঞানস্বরূপ। দুই-ই এক। একটার approach (অগ্রসর) 'ইতি' 'ইতি' করে, অন্যটার 'নেতি নেতি' করে। বস্তু এক।

মোহন — ঠাকুর কি এই sense-এ (অর্থে) বলেছেন, শুদ্ধভক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান এক?

শ্রীম — তাই তো মনে হয়। 'ইতি'পথে অগ্রসর হওয়া মানে, idealise the real. 'Real', অর্থাৎ এই নামরূপ বনে জগৎকে ঈশ্বরবুদ্ধি দিয়ে দেখা — 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'। শেষে সবই ঈশ্বর হয়ে যায়। শ্রীরাধা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করতে করতে সব কৃষ্ণময় দেখতেন। নিজেকেও কৃষ্ণময় দেখতেন। এই ভাবটাই যখন ঘনীভূত হয়, তখন শেষে এই বাহ্য নামরূপে অতীত, একটা প্রেমময় বা প্রেমস্বরূপে অস্তিত্ব থাকে। সেই অস্তিত্বটাকেই নানা পথে গিয়ে দ্রষ্টাগণ নানা নামে বলে থাকেন — সৎ চিৎ আনন্দ শান্তি প্রেম আদি। ভক্তিপথে, 'ইতি'-পথে যাও, তবে শেষ মহাভাব। আর 'নেতি'-পথে যাও, তবে শেষ নির্বিকল্প সমাধি, জ্ঞানরূপে মিলন — to realise the ideal. একটার অগ্রসর লীলার দিক দিয়ে। অন্যটার নিত্যের দিক দিয়ে। এই অর্থে ঠাকুর, 'লীলাও সত্য, নিত্যও সত্য' বলেছেন।

মহাভাবে নামরূপের লেশ যা থাকে, তা এই জাগতিক নামরূপ নয়, কিন্তু পারমার্থিক। এই universe-এর (ব্রহ্মাণ্ডের) পরপারের জিনিস ওটা — নিত্য শাস্ত্র বস্তু—প্রেমসমুদ্র। সে অবস্থায় জাগতিক ব্যবস্থার সব শেষ হয়ে যায়, দেশ কাল সব ভেদ ঘুচে যায়। সব একাকার। যে একের দুই নাই, সেই এক — সেই একে একাকার।

৩

এই সব চিন্তার শক্তি কত — অমোঘ শক্তি! জাগতিক time and space (স্থান কালের) সঙ্গে এর influence (প্রভাব) থাকে সব চিন্তার — atmosphere, আবহাওয়ায় থাকে এর স্পর্শ। তাই এই ভাবের

লোক গেলে ঐ তীর্থাদিতে অত আনন্দ শান্তি সুখ লাভ করে। তীর্থ মানে, যেখানে ভগবান কোনও স্থানকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হন। আর ঋষি মহাপুরুষ অবতার মানে, যখন কোন মানুষের শরীর অবলম্বন করে প্রকটিত হন।

পুরী চৈতন্যদেবের অবতারের ভাবসম্ভোগের লীলাভূমি। কত রকম ঈশ্বরীয় দর্শন, সম্ভোগ হয়েছে ওখানে। তেমনি দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর তাই নিজে বলেছিলেন একটি ভক্তকে (শ্রীমকে) পঞ্চবটীর কুটীরে থাকতে। ঠিক এই কথা বলেছিলেন, ‘এখানে ঈশ্বরীয় কত দর্শন আলাপন সম্ভোগাদি হয়েছে’। ভক্তটি কবি, তাই চেয়েছিলেন ন’বতের উপরের ঘরে থাকতে। ঠাকুর তা দিলেন না। ঐ পঞ্চবটীর কুটীরে থাকতে বললেন।

এই সব দৈবী ঐশ্বর্যের দাম নাই, অমূল্য! এই সব জীবন্ত জাগ্রত ঐশ্বর্য লাভ হয় ওসব স্থানে থাকলে — পুরী, দক্ষিণেশ্বর আদি মহাতীর্থে।

পুরীর আরও কত মাহাত্ম্য! চৈতন্যদেবের ভক্তরা এক এক বিরাট পুরুষ! হরিদাস ঠাকুর তাঁদের একজন। তিনি রোজ তিন লক্ষ নাম জপ করে তবে জল গ্রহণ করতেন। গদাধরের কি ভালবাসা চৈতন্যদেবের জন্য! স্বরূপ দামোদর পুরী, রায় রামানন্দ, শিখি মাইতি, আর তাঁর ভগিনী মাধবী দেবী — এঁরা অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রেমিক ভক্ত।

ঠাকুর আমাকে নিজে বলেছেন, আমিই পুরীর জগন্নাথ। তাই আমাকে কয়েকবার পাঠিয়ে দিছিলেন পুরীতে। আবার আমাকেই বলেছিলেন — ক্রাইস্ট, চৈতন্য আর আমি এক। নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, এই যে লোক ‘গৌর গৌর’ করে, সেই গৌর আমি। ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, আমি আর চৈতন্য এক।

তাই পুরীতে নিজে যেতেন না। বলেছিলেন, পুরী গেলে শরীর চলে যাবে ঐ (চৈতন্যদেবের) উচ্চ মহাভাবে। মানে, পূর্ব স্মৃতি স্মরণ হবে। উহা এ শরীর ধারণ করতে পারবে না। গয়াতেও যান নাই ঐ জন্যে। বলতেন, শরীর চলে যাবে। ওখান থেকে এসেছিলেন কিনা।

অবতার এসে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন, গুপ্ত তীর্থ জাগ্রত করেন, আর নূতন তীর্থ তৈরী করেন।

এই সব দৈবী সম্পদ উপভোগ করা যায় ওখানে, পুরীতে। আর

ঝঞ্জাট কম। মহাপ্রসাদ কিনে খাও। নানা রকম মহাপ্রসাদ পাওয়া যায় — ঘি-ভাত, মাখন, মিস্তান্নাদি। রান্নাবান্নার ঝঞ্জাট থাকলে সব সময় ওতেই চলে যায়।

কত দেশের লোক আসছে ওখানে — সারা ভারতের লোক। আবার ভারতের বাইরের লোকও আসে। তাই পুরী ভক্তদের জন্য যেন বৈকুণ্ঠ!

একজন ভক্ত কিছু সন্দেশ আনিয়াছেন। শ্রীম-র কথামত উহা ঠাকুরকে নিবেদন করা হইল। ইহার কতক অংশ আলাদা করিয়া রাখা হইল সাধুসেবার জন্য। মনোরঞ্জন উহা অদ্বৈতাশ্রমে দিয়া আসিলেন। অপরাংশ ভক্তগণ পাইলেন। শ্রীম জুতা ছাড়িয়া একটি কণা মুখে দিলেন। এখন রাত্রি দশটা।

পরের দিন সকাল আটটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য, দরজার গোড়ায়। আগামী কাল পুরী যাইবেন স্থির হইয়াছে। সঙ্গে কে যাইবেন সেই কথা হইতেছে। গিন্নীমা যদিও সম্প্রতি পুরী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তথাপি তিনি পুনরায় যাইবেন শ্রীম-র পরিচর্যার জন্য। আর বিনয় যাইবেন। তাঁহার অবসর আছে। সুখেন্দু কর্মক্লাস্ত ও রুগ্ন, তিনিও যাইবেন। বায়ু পরিবর্তন, অবসর ও মহাপুরুষসংশয় — এই তিন কার্যই সিদ্ধ হইবে একসঙ্গে।

শ্রীম অশ্বত্বাসীকে বলিলেন, আপনি একখানা টাইমটেবল নিয়ে আসুন বি.এন.আর-এর। ওটা পড়ে আমাদের মুখে মুখে বলবেন জ্ঞাতব্য বিষয় সব।

শ্রীম মর্টন স্কুলের রেজ্টার। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবু স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। প্রভাসবাবু মাঝে মাঝে আসিয়া স্কুলের পরিচালনার ও অন্যান্য কর্মের সম্বন্ধে শ্রীম-র সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন।

এখন বেলা একটা। শ্রীম দ্বিতলের সভাগৃহে বসিয়া আছেন। ছোট জিতেন পাশে বসা। অশ্বত্বাসী বেঙ্গল নাগপুর রেলের টাইম টেবিল পড়িয়া শ্রীমকে শুনাইতেছেন, প্রধান প্রধান নিয়মগুলি। ইতিমধ্যে অপর ভক্তগণ আসিতেছেন, যাইতেছেন। সকলেই জানিয়াছেন শ্রীম কাল পুরী যাইবেন।

শ্রীম অশ্বত্বাসীকে বলিলেন, আপনি আজের ডাকে সিদ্ধানন্দকে পত্র

লিখে দিন, কাল আমরা পুরী যাচ্ছি বলে। তাহলে কাল পাবেন, তবেই পরশু সকালে স্টেশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন। উনি ‘সৈকতালয়ে’ রয়েছেন।

সারা দিনই ভক্তসমাগম চলিয়াছে। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তরা অনেকে উপস্থিত। বড় জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, দুর্গাপদ মিত্র, ডাক্তার, বিনয়, সুখেন্দু, ছোট জিতেন, জগবন্ধু, প্রভৃতি।

শ্রীম-র মন পুরী চলিয়া গিয়াছে, শরীরটা কেবল কলিকাতায়। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাই পুরীরই অনুচিন্তন চলিতেছে। তাই পূর্ব স্মৃতির অনুকীর্তন করিতেছেন। মন পুরীতে নিবদ্ধ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটি সিনের কথা মনে পড়ছে। তখন এইটিন্-নাইন্টিফোর (1894)। ঠাকুরের শরীর গেছে আট বছর। আমি পুরী গেছি। উঠেছি পাণ্ডুর বাড়িতে। বাবুরাম তখন আছেন বলরামবাবুর বাড়ি ‘শশী নিকেতনে’। বলরামবাবুও রয়েছেন সেখানে। মন্দিরে দেখা হল। তখন ধরে নিয়ে এলেন আমায় ‘শশী নিকেতনে’।

তখনই প্রথম ‘কথামৃত’ পড়ে শোনাই, যেমন পাঠকরা করে। বাড়ির সকলেই আছেন। অনেক স্ত্রীলোক বসা ওখানে পর্দার আড়ালে। বাইরে পুরুষরা। বাবুরাম, বলরামবাবু — এঁরাই প্রধান শ্রোতা। তখনও বই বার হয় নি — ডায়েরী মাত্র।

তাঁর শরীর চলে গেলে ভক্তরা পাগলের মত হয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর ‘কথামৃত’ ভক্তদের প্রাণ শীতল করেছিল অমৃতের মত। কাঁটি বা ভক্ত তখন — আঙ্গুলে গোনা যায়।

শ্রীম তিনতলায় আহাৰ করিতে গেলেন। ভক্তরা পুরীর কথাই কহিতেছেন! শ্রীম গেলে এখানকার ভক্তরা অনাথ হইবেন, ওখানে নূতন ভক্ত সৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি নানা কথা।

শ্রীম ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসনে বসিয়াই বলিলেন, তাহলে কোন্ ক্লাসে যাওয়া উচিত? অস্ত্রবাসী বলিলেন — কেন, থার্ড ক্লাসে। শ্রীম-র মনোমত কথা হইয়াছে। তাই অস্ত্রবাসীর কথাকেই নিজের খাড়া করিলেন। অপর ভক্তরা উচ্চ শ্রেণীর কথা বলিলেন। কিন্তু শ্রীম বলিলেন

— না, তা আর হয় না। ইনি যেখানে বলেছেন থার্ড ক্লাসে যাওয়া ভাল, তাই হবে। ভক্তের কথা ভগবানের কথা কিনা।

অন্তেবাসী জানেন শ্রীম থার্ড ক্লাসে যাইবেন। তাই থার্ড ক্লাসের কথা বলিলেন। ট্রামে শ্রীম সেকেণ্ড ক্লাসে যান। উহা কি কার্পণ্য? না, তা নয়, তপস্যা। শ্রীম যে নিজ গৃহে অতিথি, কিংবা বড় বাড়ির ঝি, কিংবা পাশ্চাত্যের অধিবাসী! কাহার পয়সা খরচ করিবেন, সব যে ঠাকুরে সমর্পিত।

রাত্রি নয়টা। শ্রীম ছাদে বেড়াইতেছেন — সঙ্গে ডাক্তার ও বিনয়, জগবন্ধু ও ছোট জিতেন। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, কাল সকালে আপনি অনিলবাবুকে খবর দিন। বলবেন, তিনি বলে পাঠিয়েছেন — *if willing he can join* (যদি ইচ্ছা হয় যোগদান করতে পারেন) ভাইফোঁটার পর। অনিলবাবু কর্মপ্রার্থী শিক্ষক, মর্টন স্কুলে।

কলিকাতা, ৭, নম্বর শংকর ঘোষ লেন।

৫ই অক্টোবর ১৯২৫ খ্রীঃ, ১৯শে আশ্বিন ১৩৩২ সাল।

সোমবার, কৃষ্ণ চতুর্থী।